প্রকাশক :
অনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
৬।১, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব

ভাষাকে অবলম্বন করিয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও চিন্তা-শক্তির প্রসার হইয়াছে। ভাষার মধ্য দিয়াই আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছিল। ভাষার মধ্য দিয়াই সেই সব সামাজিক প্রবৃত্তি ও সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া মানুষকে পশুত্বের স্তর হইতে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং তাহাকে চিন্তাশীল মানুষে পরিণত করিয়াছে। ভাষাই সমস্ত চিন্তার বাহন—এমন কি চিন্তার জন্মদাত্রী।

ভাষা যেমন মানুষের মনের চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে, সাহিত্য সেই চিন্তা ও অনুভূতিকে সৌন্দর্য ও রস-মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ পূর্বক আমাদের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে। ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত,—ভাষাই সাহিত্য-রচনার প্রধান উপাদান—তাহার ভিত্তিভূমি।

ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা জাতির মানসিক বিকাশ, হৃদয়বৃত্তির স্বরূপ, তাহার চিন্তা ও কল্পনা, ধ্যান-ধারণা-আদর্শ, তাহার বৈষয়িক জ্ঞান ও সম্পদ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই জানিতে পারি। ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ডে জাতির উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার সম্ভব হয়। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে জানাই জাতিকে জানা—জাতির যথার্থ পরিচয়লাভের উহাই উৎকৃষ্ট পথ। বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য পাঠের দ্বারাই আমরা বাঙালী জাতিকে প্রকৃতভাবে

চিনিতে পারিব—তাহার অতীত-বর্তমানকে জানিব—তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঙ্গতভাবে আশা পোষণ করিতে পারিব।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে কখন মানুষ বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদের কি নির্দিষ্ট ভাষা ছিল, তাহা ঠিকভাবে জানা যায় নাই। খ্রীষ্টজন্মের অন্তত দেড়হাজার বছর আগে আর্যগণ ভারতে আসে। তাহাদের আর্যভাষার নিদর্শন আমরা পাই ঋগ্বেদের মধ্যে। আর্যগণের ভারতে আসিবার অনেক পরে তাহারা বাংলায় বসতি স্থাপন করে। তাহাদের বাংলায় আসার সঙ্গে আর্যভাষা বাংলায় প্রবেশ করে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, বাংলাদেশে আর্যভাষা আসিবার পূর্বে এখানকার লোকেরা অস্ট্রিক অথবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা বলিত। এই ভাষার ক্ষীণ নিদর্শন কেবল কয়েকটি স্থানের নামে বা দ্রব্যের নামে বর্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত-শাসনকালে বাংলা আর্যভাষা-ভাষীদের সম্পূর্ণ সংস্রবে আসে এবং আর্যভাষা ও সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

আর্যেরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের কথ্যভাষার মধ্যে অল্পসল্প পার্থক্য ছিল। তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কথ্যভাষাতেই বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়। কালক্রমে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এই কথ্যভাষার পরিবর্তন হইতে লাগিল। তখন আর্যদের কথ্যভাষার সংস্কার করিয়াই সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইল। এই সংস্কৃতই হইল সর্বভারতীয় আর্যগণের সাহিত্য-রচনার ভাষা। বৈদিক সাহিত্য ব্যতীত সমস্ত রচনাই এই পরিমার্জিত ও স্থায়িরূপপ্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত হইতে লাগিল।

এই শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অপেক্ষাকৃত অমার্জিত কথ্যভাষার একটা ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। সেই ধারা ক্রমে স্ফীতকায় হইতে লাগিল

এবং শেষে আর্যভাষা বৈদিক ও সংস্কৃতের রূপ অনেকখানি বদলাইয়া দিয়া সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিল। এই ভাষার নাম হইল 'প্রাকৃত' ভাষা—প্রকৃতি বা প্রজাপুঞ্জের বা জনসাধারণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। এই ভাষাতে সাহিত্যরচনাও চলিতে লাগিল। এই পরিণতির প্রথম স্তরের নিদর্শন পাওয়া যায় অশোকের শিলালিপিতে এবং প্রাচীন পালি-সাহিত্যে। দ্বিতীয় স্তরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই কথ্য প্রাকৃত ভাষাই শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী প্রভৃতি নামে সাহিত্যিক ভাষায় বিকশিত হইয়া উঠিল। এই সব প্রাকৃত ভাষাতে সাহিত্য রচিত হইল এবং সংস্কৃত-নাটকের কথোপকথনের মধ্যেও ইহারা স্থান লাভ করিল। যে প্রাকৃত ভাষায় রূপকথা বা লোক-সাহিত্য রচিত হইল, তাহার নাম হইল 'পৈশাচী প্রাকৃত'।

তারপর এই বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা ধ্বনি-সারল্যে কথ্য ভাষার একান্ত অনুগামী হইয়া পড়িয়া এক নূতন রূপ প্রকটিত করিল। ভাষার এই অবস্থাকে বলা হয় 'অপভ্রংশ' বা সাধারণের একান্ত চলিত ভাষা। এই অপভ্রংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানভেদে ও কালভেদে রূপান্তর লাভ করিয়া ক্রমে হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী-পাঞ্জাবী-সিন্ধী-বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় পরিণত হইল। এই অপভ্রংশ অবস্থা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার অব্যবহিত পূর্বাবস্থা। বাংলাও এইরূপ 'মাগধী অপভ্রংশ' হইতে উদ্ভূত।

বাংলা ভাষার পরিণতির স্তরগুলি এইভাবে নির্দেশ করা যায়—

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছে আনুমানিক দশম শতাব্দীতে। সংস্কৃতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ থাকিলেও ইহা কথ্যভাষার প্রত্যক্ষ বংশধর। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলার প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেছে 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ'। চর্যাপদের ভাষার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে অপভ্রংশের স্তর পার হইয়া বাংলা শব্দ তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পদগুলির ব্যাকরণ মধ্যযুগের বাংলা ও বর্তমান যুগের বাংলার ক্রম-পরিবর্তনের নিয়মিত এবং সুস্পষ্ট সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন ভাষার খাঁটি নিদর্শন।

বাংলা ভাষা যখন প্রথম স্বতন্ত্র ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন

প্রাকৃত বা অপভ্রংশ হইতে সেই প্রাচীন বাংলার বিশেষ কোনও বিভিন্নতা ছিল না। ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষা আধুনিক রূপ লাভ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন-ক্রম লক্ষ্য কর।—

বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	আধুনিক বাংলা
অস্মে	অম্হে	অম্হি	আহ্মি	আমি
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
অষ্টাদশ	অট্ঠারহ	অট্ঠারহ	আঠারহ	আঠার
শৃণোতি	সুণদি, সুণই	সুণই	শুনই	শুনে
ভবতি	হোদি, হোতি	হোই	হোই	হয়

বৈদিক ভাষা হইতে আধুনিক বাংলা ভাষার সম্ভাব্য ক্রম পরিণতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। নিম্নে সেইটি উদ্ধৃত করা গেল।—

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার দুইটি লাইন এইরূপ।—

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

এইটিকে আধুনিক কথ্য বাংলায় প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়।—

গান্ গেয়ে না' বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন (জ্যান্যো) মনে হয়, চিনি ওরে।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যযুগের বাংলায় ইহা এইরূপ ছিল।—

গান গায়া (গাইহ্যা) নাও ব্যায়া (বাইহ্যা)
কে আস্তে (আইসে) পারে,
দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন অ (জেন্হ, জেহেন) মনে হোএ
চিনী (চিন্ হীয়ে) ও আরে (ও হারে)।

আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন বাংলায় ইহার রূপ ছিল।—

গাণ গাহিঅ নাব বাহিঅ কে আইশই পারহি,
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই চিন্‌হি অই ওহারহি।

আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাগধী অপভ্রংশে ইহার রূপ।—
গান গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই (কি) আবিশই পারহি (পালহি),
দেক্‌খিয় জইহণঁ (জইশণঁ) মনহি হোই চিণ্‌হিঅই ওহঅরহি
(ওহঅলহি)।

আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মাগধী প্রাকৃতে—
গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) কগে (কএ)
আবিশদি পালধি (পালে),
দেক্‌খিঅ (দেক্‌খিত্তা) য্যাদিশণং মনধি হোদি (ভোদি)
চিণ্‌হিঅদি অমুশ্‌শ কলধি
(= অমুশ্‌শ কদে)।

আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে প্রাচ্য প্রাকৃতে ইহার রূপ ছিল।—
গাণং গাথেত্বা নাবং বংহেত্বা ককে (কে) আবিশতি পালধি (পালে),
দেখ্‌খিত্বা যাদিশং (যাদিশনং) মনধি (মনসি) হোতি (ভাতি)
চিণ্‌হিয়তি অমুশ্‌শ কতে।

আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের বৈদিক ভাষাতে ইহার
রূপ হইবে—

গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা ককঃ (কঃ) আবিশতি পারধি
(= পারে),

দৃক্ষিত্বা (= দৃষ্ট্বা) যাদৃশম্ মনোধি (মনসি) ভবতি চিহ্ন্যতে
অমুষ্য কৃতে (= অসৌ অস্মাভিঃ জ্ঞায়তে)।

চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। এই বইখানি হাতে-লেখা পুঁথির আকারে দীর্ঘদিন নেপাল মহারাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহা আবিষ্কার করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়া ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চর্যাপদের আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঊর্ধ্বতম সীমানা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। চর্যাপদ হইতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আরম্ভ।

চর্যাপদ কতকগুলি গানের সমষ্টি। গানের উপযোগী ছোট ছোট কবিতাকে 'পদ' বলা হয়, আর 'চর্যা'র অর্থ আচরণ বা অনুষ্ঠান। যে পদে বা গানে সাধকের আচরণীয় বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাই চর্যাপদ বা চর্যাগান। এই পদগুলি সেকালের কীর্তনের পদ। এগুলি রাগ-রাগিণী সহযোগে গান করা হইত। কোন্ পদ কি রাগ-রাগিণীতে গাওয়া হইবে, তাহার উল্লেখ প্রত্যেক পদের প্রথমেই আছে।

ধর্মকে অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব হইয়াছে। দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর সমস্ত সাহিত্য-প্রচেষ্টার উৎসই ছিল ধর্ম। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা পালরাজগণের শাসনাধীনে ছিল। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। এই সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। পাল-রাজত্বের সময় মহাযান বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রথমে বজ্রযান ও শেষে সহজযানে পরিণতি লাভ করে। এই সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের কথা গানের আকারে লিখিত হইয়াছে চর্যাপদে। ঐ সম্প্রদায়ের গুরুগণ এই সব গানে তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ-নির্দেশ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গানের শেষে কাহ্নু, ভুসুকু, লুই, সরহ প্রভৃতি গুরুগণের নামের উল্লেখ বা ভণিতা পাওয়া যায়। বিভিন্ন সিদ্ধ-সাধক গুরুগণের

৪৭টি পদ এই চর্যাপদ গ্রন্থে আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই পদগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

এ গানগুলির বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন-ভজনের তথ্য। যাহারা এই ধর্মের সাধক তাহাদের জন্যই গুরুগণ এই পদ রচনা করিয়াছেন ; ইহার গূঢ় সংকেত সেই সাধকরাই বুঝিতে পারে। এই আভ্যন্তরিক অর্থের জন্যই এই চর্যাগানগুলি রচিত। সুতরাং সাধারণ পাঠকের নিকট ইহার অধিকাংশই দুর্বোধ্য হেঁয়ালি স্বরূপ মনে হয়।

এইগুলি ধর্মবিষয়ক গান হইলেও ইহার মধ্যে সাহিত্যরসের কিছু অস্তিত্ব আছে। গান-রচয়িতারা তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যে উপমা ও রূপক ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব জীবন হইতে গৃহীত। বৈঠা দিয়া নৌকা বাওয়া, সাঁকোর সাহায্যে নদী পারাপার করা, হরিণ শিকার করা, শুঁড়ির মদ বিক্রয় করা, তুলা ধুনা, ডোমনীর বাঁশের চাঙ্গাড়ি বুনা, দাবাখেলা, বীণা বাজানো, বিবাহের শোভাযাত্রার ঢাক ও মাদলের বাজনা প্রভৃতি জীবন-চিত্রের সাহায্যে তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব রূপায়িত হইয়াছে। এই সব অলংকার-প্রয়োগের মধ্যে একটা সহজ কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি পদের শব্দবিন্যাস ও ছন্দপ্রয়োগে একটা গীতি-কবিতার সুর কানে বাজে।

চর্যাপদের কয়েকটি গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে, ইহা হইতে উহার ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা হইবে।—

জো মণগোএর আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।
কাঅবাক্‌চিঅ জস্মু ণ সমায়॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকৃপথাতীত কাহিব কীস॥

জে তই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল ॥

[যাহা-কিছু মন দিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন আগম-শাস্ত্র, জপের মালা, পুঁথির জ্ঞান—সবই ভোজবাজির মত মিথ্যা। যেখানে কায়বাক্‌চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সহজের (সহজিয়া মতের), কথা বল, কেমন করিয়া বলা যায়। বৃথাই গুরু এবিষয়ে শিষ্যকে উপদেশ দেন; যাহা বাক্যের অতীত, তাহা কিরূপে ব্যক্ত করা যায়। গুরু এখানে বোবা এবং শিষ্য কালা,—অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন, তাহা বোবার বর্ণনার মত অস্পষ্ট এবং শিষ্য যাহা বুঝে, তাহা কালার অসম্পূর্ণভাবে শোনার মত।]

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥

[গহন ও গভীর ভব-নদী বেগে প্রবাহিত হয়। তাহার দুইধারে পাঁক, মধ্যে থই নাই। ধর্মের জন্য চাটিল তাহার উপর সাঁকো গড়িয়া দিয়াছেন; পারগামী লোক তাহাই ভর করিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে।]

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥

[আমাদের করুণা-নৌকা সোনায় ভর্তি; তাহাতে রূপা থুইবার ঠাঁই আর নাই।]

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা করগুলী গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥

[উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে ব্যাধবালা (শবরী)। ব্যাধবালা ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিতা—কর্ণে তাহার গুঞ্জাফুলের মালা। হে উন্মত্ত ব্যাধ (শবর),

পাগল ব্যাধ, তুমি ভুল করিও না, আমার অনুরোধ। আমি যে তোমারই নিজ গৃহিণী, সহজসুন্দরী। গাছ নানা মুকুলে সুশোভিত হইল, গগনে প্রসারিত হইল ডাল। কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারিণী ব্যাধবালা একেলা এই বনে বিহার করিতেছে।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাপদগুলির পর দুইশত-আড়াইশত বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের আর কোনও রচনার নিদর্শন আমরা পাই নাই। তাহার পর যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা আমরা পাইয়াছি, সেইটি হইতেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। ইহাতে চর্যাপদের পরবর্তী বাংলা ভাষার নমুনা অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির পুঁথি বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক ব্রাহ্মণের গোয়ালঘরে বহুদিন অযত্নে পড়িয়া ছিল। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এই পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে ইহা মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ইহা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

পুঁথিখানির প্রথমে ও শেষে কয়েকটি পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকর্তার পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনার তারিখ প্রভৃতি কিছুই জানা যায় নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত বলিয়া সম্পাদক ইহার নাম দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

গ্রন্থমধ্যবর্তী পদে কবির নামোল্লেখ বা ভণিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কবির নাম 'বড়ু চণ্ডীদাস'। কয়েকটি পদে 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' বলিয়াও ভণিতা আছে। কয়েকটি পদে শুধু 'চণ্ডীদাস' বলিয়াও উল্লেখ আছে। হয়তো অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কবির পূরা নাম হইতে পারে। ইনি বাসুলী দেবীর সেবক ছিলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামেই বাংলা সাহিত্যে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বাঙালীর কাছে চিরদিনের আদরের বস্তু। বাঙালী কবি

জয়দেব এই বিষয় অবলম্বনে কোমল ও মধুর সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়াছেন। সেন-যুগে অন্যান্য কবি সুললিত সংস্কৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। চৈতন্য-পরবর্তী সময়েও বহু বৈষ্ণব কবি এ বিষয়ে অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন এবং এই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক রচনার ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই' এই প্রবাদবাক্য বাংলায় যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত ; যথা, জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ডের অন্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ডের অন্তর্গত হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড। এক-একটি খণ্ডে এক-একটি আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্ম, গোকুলে আগমন, কালিয়দমন প্রভৃতি ঘটনা পুরাণে বর্ণিত আছে। এগুলিকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কবি রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন বিস্তৃত-ভাবে। এই সব লীলাকাহিনী কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। মনে হয়, বহু পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে এসব কাহিনী প্রচলিত ছিল। কবি তাহাদেরই যুগোচিত কাব্য-রূপ দিয়াছেন। এই কাব্যখানি বিভিন্ন সুর-তালে গীত হইত এবং সেই সঙ্গে নৃত্য ও অভিনয় করা হইত বলিয়া মনে হয়। সেকালে পালা-গানের সঙ্গে কিভাবে নাট-অভিনয় চলিত তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। পরবর্তী রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক রচনাতে 'দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড' প্রভৃতির অবতারণার মূল উৎস এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির নির্দিষ্ট পরিচয় আমরা পাই নাই। চণ্ডী-দাসের ভণিতাযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহু বিখ্যাত পদের সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত। কিন্তু ভাষা, ভাব-কল্পনা ও রচনাভঙ্গীর দিক দিয়া সেই সব পদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের বিস্তর পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অত্যন্ত পুরানো, প্রায় চর্যাপদের কাছাকাছি ;

ভাবকল্পনাও স্থূল এবং অমার্জিত-রুচির পরিচায়ক। প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর ভাব-গভীরতা, আধুনিক ভাষা ও রচনা-সৌন্দর্য ইহাতে নাই। সহজেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাস ও প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস এক কবি নন। পদাবলীর ভণিতায় কোথাও 'দ্বিজ', কোথাও 'দীন', আবার কোথাও কেবল 'চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাসও নিজেকে বাসুলীর সেবক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কয়েকটি প্রচলিত পদে বড়ু চণ্ডীদাসেরও ভণিতা পাওয়া যায়। তবে ভাষা ও ভাবের বিচারে সে পদগুলি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়।

চণ্ডীদাসের বাসস্থান সম্বন্ধেও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। কেহ বলেন, তাঁহার বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে; আবার কেহ বলেন, তাঁহার বাড়ি ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। যাহা হউক, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুই বা ততোধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা কবি চৈতন্য-পূর্ববর্তী। তাঁহার নাম বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস বা অন্য কোন কবি যাঁহারা পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই চৈতন্য-দেবের পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত অলংকারের প্রভাব তাঁহার রচনায় লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও ভাগবত তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। এই সব গ্রন্থের প্রভাব তাঁহার কাব্যের মধ্যে পড়িয়াছে। প্রসঙ্গারম্ভে স্থানে স্থানে তিনি সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাঝে মাঝে বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তির বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধার রূপ-বর্ণনা এইরূপ—

কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর॥

কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥...
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে বসি তপ করে নীল-উতপল॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জল মাঝে॥

যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের বাঁশীর রবে রাধার ব্যাকুলতা ও বেদনা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥...
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।...
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

কৃষ্ণের বিরহে রাধার বিরহ-ব্যথা কবির হাতে এইভাবে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে—

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআঁইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বালগোপাল॥...
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥

কাহ্নু বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥

রাধার এই মিলন-ব্যাকুলতা ও বিরহ-বেদনা চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদকর্তাদের মাথুর পদাবলীতে গভীরত্ব ও ভাব-তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্যে বিকশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

যে-সব দেব-দেবী অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সর্ববিষয়ে আমাদের মঙ্গল সাধন করেন, সেই মঙ্গল-বিধায়ক দেব-দেবীদের শক্তি ও মাহাত্ম্য কীর্তন এবং পৃথিবীতে তাঁহাদের পূজা-প্রচারের কাহিনী যে-সব কাব্যের বিষয়বস্তু, তাহারাই 'মঙ্গলকাব্য' বলিয়া পরিচিত। এই মঙ্গলকাব্যগুলি দেবদেবীর পূজা বা বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পর পর কয়েকদিন ধরিয়া সুর-তালের সঙ্গে গান করা হইত। ইহাদের কোন কোন অংশ বা পালা শ্রোতারা সারারাত্রি জাগিয়া শুনিত। সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে, এই মঙ্গলকাব্য পড়িলে, শুনিলে, এমন কি ঘরে রাখিলেও সেই সেই দেব-দেবী সন্তুষ্ট হইয়া মঙ্গল সাধন করেন।

মঙ্গলকাব্যের এই দেব-দেবী ঠিক পৌরাণিক দেব-দেবী নহেন। এইগুলি মূলে বাংলার আদিম অধিবাসী আর্যেতর জাতির দেব-দেবী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান অধিকারের ফলে বাংলাদেশে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ধর্মের একটা সমন্বয় সাধিত হয়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্যেতর সম্প্রদায় মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি নানা লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করিত। ইহাদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল স্বতন্ত্র। ইহারা মনে করিত, জীবনের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সবই দেবতার

অনুগ্রহ-নিগ্রহ হইতে আসে। তাঁহাদিগকে স্তব-স্তুতি ও পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে দুঃখ-বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই দেবদেবীরা ঈর্ষান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ, এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। তাঁহারা নিজ প্রতিষ্ঠায় বাধাদানকারীদের কঠোর শাস্তি দেন এবং অধীন ভক্তকে সর্বদা সন্তুষ্ট করেন। এই আর্যেতর জনসাধারণ গাছ, বন, পর্বত প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর অস্তিত্ব বিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করিত। আর বিশেষ বিশেষ জন্তু দেব-দেবীর অনুগৃহীত বলিয়াও তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল। এই ধারণা হইতে সর্প-দেবতা মনসা, বন-দেবতা মঙ্গলচণ্ডী, ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায়, বিড়াল-দেবতা ষষ্ঠী প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্ভব হইয়াছে।

এই সব দেব-দেবীর মাহাত্ম্য ও কীর্তি-কাহিনী ছড়া ও পাঁচালীর আকারে বহুদিন হইতে বাংলাদেশের আর্যেতর জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এই ছড়া ও পাঁচালীকে গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য পুরাণের মাল-মসলার মিশ্রণ দিয়া নূতন ভাবে এই মঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের কাব্যের পতাকাতলে বাংলার সংখ্যা-লঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুগামী এবং অগণিত আর্যেতর-ধর্ম-বিশ্বাসীরা একত্র মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত সমগ্র বাঙালী জনসাধারণের ভাব-জীবন রূপায়িত হইয়াছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

মঙ্গলকাব্যগুলি সবই প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা—একই ধরা-বাঁধা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লেখা। ইহারা কয়েকটি অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম অংশে গণেশ-বন্দনা ও নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর বন্দনা; দ্বিতীয়ে, দেবদেবীর স্বপ্নে বা প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভাব এবং কবিকে কাব্য-রচনার আদেশ দান ও কবির আত্ম-পরিচয়; তৃতীয়ে সৃষ্টি-বিবরণ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়গৃহে জন্মলাভ, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, গৌরী-বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা প্রভৃতি; চতুর্থে বা শেষ খণ্ডে, কোনও স্বর্গবাসী দম্পতীর

শাপগ্রস্ত হইয়া মর্তে জন্মগ্রহণ এবং নানা দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া বিশিষ্ট মঙ্গলদেবতার পূজা প্রচারে সমর্থ হওয়া ও শেষে এই পুণ্যফলে সশরীরে স্বর্গে গমন। এই অংশে 'বারমাস্যা' অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার বারমাসের দুঃখবর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্দা, কাঁচুলি-নির্মাণ, রন্ধনের বিশদ বর্ণনা, চৌত্রিশ অক্ষরে মঙ্গলদেবতার স্তব (চৌতিশা) প্রভৃতি আছে।

মঙ্গলকাব্যের এই কাঠামোর মধ্যে আর্য পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আর্যেতর লোক-সংস্কৃতির মিলন লক্ষ্য করা যায়। গণেশ ও অন্যান্য দেবতার বর্ণনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, মদনভস্ম প্রভৃতিতে পুরাণের প্রভাব আছে, আবার হর-পার্বতীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতিতে লৌকিক বিশ্বাসের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক অংশের মিলন দেখা যায়। মনে হয়, পৌরাণিক এবং লৌকিক উভয় ধর্মেই শিবের প্রতিষ্ঠা ছিল সর্ব-স্বীকৃত। মঙ্গল-দেব-দেবীগণের চরিত্র-চিত্রণেও এই উভয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলকাব্য মানুষকে দেবতার পাশাপাশি স্থান দিয়াছে। এই কাব্যের দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে মধ্যযুগের বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাব-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-ধারণা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য মূলত কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে অচ্ছেদ্যরূপে। মানুষের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাঁহাদের মাহাত্ম্য—মানুষের সুখ-দুঃখের তোরণ-পথেই অগ্রসর হইয়াছে তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জয়যাত্রা। মঙ্গলকাব্যের এই মানুষ কেবল সমাজের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ নয়, অনেকক্ষেত্রে সমাজের নিতান্ত নিম্নস্তরের লোক কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মানুষকে অনেক সময় দেবতা অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে। মুকুন্দরাম ব্যাধ

কালকেতুকে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক করিয়াছেন। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে কালু ডোমকে সত্যনিষ্ঠায় মহামহিমময় করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সমাজের উচ্চ ও নীচ, আর্য ও আর্যেতর ভেদ বিলোপ করিয়া তাঁহাদের কাব্যকে সমগ্র বাঙালী জাতির কাব্যে পরিণত করিয়াছেন।

সাধারণ বাঙালী-জীবনের সহিত ইহার যোগ থাকায় এককালে এই মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এই কাব্য-রচনার ধারা পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের জন্য যে-সব কাব্য রচিত, সেগুলি যথাক্রমে 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গল' নামে পরিচিত। এই রীতির অনুসরণে বিভিন্ন দেব-দেবীর কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এমন কি, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মহিমা প্রচারের জন্য 'রায়মঙ্গল' নামে কাব্যও রচিত হইয়াছে।

মনসামঙ্গল

সর্প-পূজা ভারতের আদিম আর্যেতর অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় জাতির মধ্যে এখনও বহুল পরিমাণে সর্প-পূজার প্রচলন আছে। ক্রমে সর্পমূর্তির পরিবর্তে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী নারীরূপা দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। বাংলায় পালবংশীয়দের রাজত্বকালে জাঙ্গুলী নামে বিষনাশিনী এক দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। এই জাঙ্গুলী দেবীই পাল-রাজত্বের শেষে মনসা, পদ্মাবতী, বিষহরী বা জাগুলি দেবী রূপে পূজিতা হইতে থাকেন।

মনসা লৌকিক দেবী হইলেও তাঁহাকে পুরাণের আভিজাত্যের

প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে জরৎকারু মুনির পত্নী ও আস্তিকের মাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মনসামঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ।—

মনসা শিবের কন্যা। জন্ম তাঁহার পদ্মবনে। তিনি পাতালে গিয়া নাগগণের রাণী হইলেন। একদিন শিবের সঙ্গে মনসার দেখা হইল। মনসা আত্ম-পরিচয় দিয়া আগ্রহসহকারে শিবের সঙ্গে কৈলাসে আসিলেন। কিন্তু শিব-পত্নী চণ্ডী সপত্নী-কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। দারুণ বিবাদ বাধিল। চণ্ডী খোঁচা মারিয়া মনসার একটি চোখ নষ্ট করিয়া দিলেন। ক্রোধে ও দুঃখে মনসা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে জরৎকারু মুনির সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল এবং আস্তিক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র-জন্মের পরেই মুনি তপস্যার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

এদিকে চণ্ডীর উপর মনসা ক্রোধে জ্বলিতেছিলেন। মর্তের লোক শিব ও চণ্ডীর ভক্ত, তাঁহাদিগকে নিত্য পূজা করিয়া থাকে। মর্তবাসীদের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ ও তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিলে শিব ও চণ্ডীর মহিমা ম্লান হইয়া যাইবে। ইহাই উপযুক্ত প্রতিশোধ। এইসব মনে করিয়া মনসা পৃথিবীতে নিজের পূজা-প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মনসা স্বর্গের কাননে একদিন সাপের অলংকারে ভূষিতা হইয়া বসিয়া ছিলেন। এমন সময় শিবের পরম ভক্ত চন্দ্রধর বা চাঁদ শিবপূজার জন্য ফুল তুলিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রধরকে দেখিয়া সাপেরা মনসার দেহাশ্রয় ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হঠাৎ নিরাভরণ হওয়ায় মনসা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত দিলেন—'মর্তলোকে মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর।'

চন্দ্রধর পৃথিবীতে বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া চাঁদ সদাগর নামে বণিক-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। চাঁদ শিবের উপাসক, নিত্য শিবপূজা করেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী সনকা গোপনে মনসা দেবীর

ঘটপূজা করেন। চাঁদ ইহা জানিতে পারিয়া একদিন পদাঘাতে মনসার ঘট ভাঙিয়া দিলেন। শিব ব্যতীত তাঁহার গৃহে আর কাহারও পূজা চলিবে না।

মনসা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। চাঁদ সদাগরের উপর চলিল দারুণ নির্যাতন। মনসা চাঁদের সুন্দর বাগান বাড়ি ধ্বংস করিলেন ; রাজ্যের বহু নর-নারী সর্পদংশনে মরিতে লাগিল। চাঁদের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ওঝা শঙ্কর গারুড়ী। সে সাপে-কাটা মরা মানুষকে বাঁচাইতে পারিত। হীন চক্রান্ত করিয়া মনসা তাহার প্রাণসংহার করিলেন। চাঁদ সদাগর শিবদত্ত অলৌকিক শক্তি 'মহাজ্ঞান'-এর অধিকারী ছিলেন। মনসা কৌশল করিয়া সে মহাজ্ঞান হরণ করিলেন। শেষে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দিয়া মনসা চাঁদের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিলেন।

নানা দুঃখ-শোকের মধ্যে চাঁদ সদাগর অটল, অচল। শিবই তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, তিনি অন্য দেবতাকে পূজা করিবেন না। মনসা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—'আমাকে পূজা কর, ছয়পুত্র ফিরিয়া পাইবে, মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইবে।' কিন্তু চাঁদ সদাগর হিন্তালের লাঠির আঘাতে মনসার কোমর ভাঙিয়া দিলেন। ছয় পুত্রের শোকে সনকা পাগলিনী। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—'তুমি মনসাকে পূজা কর, আমার সোনার চাঁদ বাছারা ফিরিয়া আসুক।' চাঁদ কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা সাজাইয়া বাণিজ্যে চলিলেন। বাণিজ্য শেষ করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যে ডিঙা পূর্ণ করিয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পথের মধ্যে মনসা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,— 'আমার পূজা কর, আমি সব ফিরাইয়া দিব।' চাঁদ সরোষে বলিলেন,—

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুড়ী কাণী॥

অকস্মাৎ সমুদ্রে বান ডাকিল, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা ডুবিয়া গেল। চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসিতে লাগিলেন। চাঁদ মরিলে মর্তে মনসার পূজা প্রচার হইবে না, তাই দেবী চাঁদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলেন। সমুদ্রের বুকে এক পদ্মবনের সৃষ্টি হইল। উহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিবার জন্য চাঁদ হাত বাড়াইলেন। পদ্মফুল স্পর্শ করিয়াই তাঁহার মনে পড়িল, পদ্মবনে জন্ম বলিয়াই মনসার এক নাম পদ্মা। তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে তিনি হাত সরাইয়া লইলেন। মনসার কৃপায় তিনি বাঁচিতে চাহেন না।

যাহা হউক, চাঁদ বাঁচিলেন। চাঁদ মরিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হইবে না, তাই নিজের পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই মনসা তাঁহাকে বাঁচাইলেন। কোনরূপে চাঁদ তীরে উঠিলেন। বার বৎসর নানা দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া কাল কাটিল, তবুও মনসার পূজা না করিবার সংকল্পে তিনি অটল রহিলেন। অবশেষে কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া ভিখারীর বেশে তিনি দেশে ফিরিলেন।

তাঁহার অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র লখীন্দর তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। চাঁদ তাহাকে দেখিয়া নূতন আশায় আবার সংসার গড়িতে মনস্থ করিলেন। উজানি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিবাহ স্থির হইল। রূপে গুণে বেহুলা বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্রী। কিন্তু চাঁদ দৈবজ্ঞের গণনা হইতে জানিতে পারিলেন যে বিবাহের রাত্রেই লখীন্দর সর্পদংশনে মারা যাইবে। কিন্তু চাঁদ তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অটল। মনসাকে পূজা করিয়া তিনি পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবেন না। মনসার ক্রূর চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য তিনি সাঁতালি পর্বতের উপর লোহার বাসর-ঘর নির্মাণ করাইলেন। সাপ যাহাতে তাহার ত্রিসীমানায় না আসিতে পারে তাহার জন্য সব রকম বন্দোবস্ত করা হইল। কিন্তু সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও চুলের মত সরু এক ছিদ্রপথে মনসার আদেশে এক সাপ প্রবেশ করিয়া বিবাহের রাত্রে বাসরঘরেই লখীন্দরকে কামড়াইল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হইল।

চারিদিকে হাহাকার পড়িল। কিন্তু সদ্যোবিধবা বেহুলা একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিল না, মনে এক দৃঢ় সংকল্প করিল। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে সেকালে জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা ছিল। লখীন্দরের মৃতদেহকেও সেইরূপে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু বেহুলা তাহার কঠোর সংকল্প প্রকাশ করিল যে, সে তাহার মৃত স্বামীর সহগামিনী হইবে এবং স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট হইতে স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। আত্মীয়-স্বজন এই কঠিন ও বিপজ্জনক সংকল্প ত্যাগ করিতে বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু বেহুলা কাহারও কথা শুনিল না। মৃত স্বামীর দেহ কোলে করিয়া সে ভেলায় গাঙ্গুড় নদীতে ভাসিয়া চলিল।

ছয়মাস সে ভাসিয়া চলিয়াছে। কতজন কত প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর শব ত্যাগ করিতে বলিয়াছে, কত মাংসাশী পশুপক্ষী তাহা খাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই বেহুলা তাহার স্বামীর দেহ ছাড়ে নাই। অবশেষে স্বর্গের ধোপানী নেতার ঘাটে ভেলা পৌঁছিল। নেতার পরামর্শে বেহুলা স্বর্গে দেবসভায় নৃত্য দেখাইয়া সমস্ত দেবগণকে—বিশেষ করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল। শিবের আদেশে মনসা লখীন্দর ও চাঁদের ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দিলেন। শর্ত রহিল বেহুলা শ্বশুরকে দিয়া মনসার পূজার ব্যবস্থা করিবে। বেহুলা স্বামী ও ছয় ভাশুরকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিল। এদিকে চৌদ্দ ডিঙাও দ্রব্যসম্ভার সহ ফিরিয়া আসিল। চাঁদ এতদিন কাহারও অনুরোধে মনসার পূজা করেন নাই। এবার বিজয়িনী সাধ্বী পুত্রবধূর অনুরোধে তাঁহার চিত্ত কোমল হইল। তিনি মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মর্তে মনসার পূজা প্রচারিত হইলে শাপান্তে সকলে স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহাই মনসামঙ্গলের কাহিনী। সর্পবহুল বাংলা দেশে এই কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। চাঁদ সদাগরের পৌরুষ, তাঁহার চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা, তাঁহার সর্বত্যাগী আদর্শনিষ্ঠা, বেহুলার চরিত্রের

একাধারে কোমলতা ও নির্ভীক তেজস্বিতা, তাহার সতীত্বের অতুলনীয় মহিমা সর্বশ্রেণীর বাঙালীর মর্মমূলে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অপূর্ব রস-প্রেরণা জোগাইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা-রূপে প্রায় একশত কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের কবিই এই মনোহর, করুণ-মধুর কাহিনীকে তাঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়াছেন।

মনসামঙ্গলের আদি কবি মনে হয় হরিদত্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্ত তাঁহার কাব্যে হরিদত্তকে মনসার গানের আদি-রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় হরিদত্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিদত্তের রচিত পদ যে কয়টি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মনসার সর্পসজ্জার বর্ণনাটি সুন্দর—

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলার সুতলী।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী॥

মনসামঙ্গলের আর একজন প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব। ইনি ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মনসাগীতির নাম 'পদ্মাপুরাণ'। তাঁহার

কাব্য বঙ্গদেশ ছাড়া আসামেও প্রচলিত ছিল। তিনি সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। মনসামঙ্গল-কাহিনীর অন্তর্নিহিত করুণ রস তাঁহার রচনার অনেকস্থলে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সর্পদংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া লখীন্দর নিদ্রাচ্ছন্ন বেহুলাকে জাগাইয়া বলিতেছে—

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণ রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লখীন্দর॥
মাও সনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিব পরাণি॥
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্রশোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ॥

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য বঙ্গদেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে, সমধিক প্রচলিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর একবারে শেষে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। তাঁহার কাব্য পদ্মাপুরাণ নামেই বেশি পরিচিত। কবির নিবাস ছিল বাখরগঞ্জ জেলার গৈলাফুল্লশ্রী গ্রামে।

বিজয়গুপ্তের কাব্যের অনেকস্থলে তৎকালীন বাস্তব সামাজিক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবদেবীর চরিত্র-চিত্রণেও সেকালের সমাজের বাস্তব নরনারী-চরিত্রের বিশেষ ছাপ পড়িয়াছে। সে যুগের বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উপাদান ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। এইদিক দিয়া বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের একটা বিশেষ মূল্য আছে। হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতাও বিজয়গুপ্তের

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া শিব চণ্ডীকে তাহার আয়োজন করিতে বলিলে দরিদ্র সংসারের গৃহিণী চণ্ডী বলিতেছেন—

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে,
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে॥

ইহার উত্তরে—

হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥

চৈতন্য-পূর্ববর্তী সাধারণ দরিদ্র বাঙালী সমাজের একটি চিত্র ও স্থূল গ্রাম্য রসিকতার নিদর্শন হিসাবে এই অংশটি মূল্যবান। বিজয়-গুপ্তের অঙ্কিত পুত্রশোকাতুর সনকার চরিত্র সজীবতায় ও মর্মস্পর্শিতায় সমস্ত মনসামঙ্গল-কবিদের রচনার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক আর একজন কবি বিপ্রদাস পিপলাই। তাঁহার কাব্যের নাম 'মনসা-বিজয়'। তাঁহার বাড়ি ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্বাংশে। তাঁহার কাব্যে মনসার জন্ম, শিব কর্তৃক গৃহে আনয়ন, চণ্ডী দ্বারা নির্যাতন প্রভৃতি পুরাণের অনুসরণে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী অর্থাৎ বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী ইহার মধ্যে নাই। কেবল চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা পর্যন্ত আছে। বাণিজ্য উপলক্ষে নদীপথে নানা দেশে গমন ও চাঁদের দ্রব্যবিনিময় প্রভৃতির বর্ণনা সেকালের বাঙালীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচেষ্টাকে কিছু প্রতিফলিত

করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনুপাম-পাটনের রাজার সহিত চাঁদের দ্রব্যবিনিময়ের বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক।—

হরিদ্রা দেখায় চাঁদ করিয়া মন্ত্রণা।
ইহাতে খণ্ডায় যত ব্যাধির যন্ত্রণা॥
ইহার বদল সোনা কহিনু তোমারে।
ওজন করিয়া লও দেহ তো আমারে॥
খোম ধুতি যত দেখহ রাজন।
বদলিয়া পাটে বোঝা দেহ তো বসন॥
পাড়ু কুমড়া দিয়া কহে নৃপবর।
ইহার বদলে দেহ সিসার খাপর॥
হস্তিদন্ত দেহ মোর মিশির বদলে।
তণ্ডুল বদলে দেহ মুকুতা প্রবালে॥

মনসামঙ্গলের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি দ্বিজ বংশীদাস। ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া মনে হয়। বংশীদাস ময়মনসিংহ জিলার অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন। কবির ভাষা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সহজ ভাবানুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশে মনসামঙ্গল-কাহিনীর করুণ রস তাঁহার কাব্যে শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। তিনি নিজে গায়ক ছিলেন, এবং ভাসান গানের এক দল বাঁধিয়া সেই দল লইয়া স্বরচিত মনসার গান গাহিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। কথিত আছে, একবার তিনি তাঁহার দল লইয়া গান গাহিবার জন্য নৌকা করিয়া একস্থানে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে দস্যু কেনারাম তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। বৃদ্ধ কবি তখন জন্মের মত একবার মনসার গান গাহিয়া লইতে চাহিলেন। কেনারাম তাহাতে স্বীকৃত হইল। ভক্ত ও সুগায়ক কবির কণ্ঠে বেহুলার দুঃখের গান

শুনিয়া দস্যুর হৃদয় বিগলিত হইল। কেনারাম হাতের অস্ত্র ফেলিয়া কবির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং চিরদিনের মত দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। চাঁদ সদাগরের চরিত্র বংশীদাসের এক অপূর্ব সৃষ্টি। সমস্ত মনসামঙ্গল-কাব্যের মধ্যে এরূপ চরিত্র-চিত্রণ আর দেখা যায় না। চাঁদের দৃপ্ত পৌরুষ ও অটল আদর্শনিষ্ঠা কবির তূলিকায় চমৎকার ফুটিয়াছে।

চৌদ্দ ডিঙা ডুবিয়া যাইবার পর যখন সর্বহারা চাঁদ সদাগর একাকী গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার সহগামী মাঝি-মাল্লা, ভৃত্য ও কর্মচারিগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহাদের পরিবারবর্গ অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।—

বিলাপ করয়ে লোকে স্বামীর মরণ শোকে
ফেলায় কেহ শঙ্খ সিন্দুর ॥
বাড়ী বাড়ী উঠে রোল রাজ্যময় গণ্ডগোল
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়।
চান্দর চরণে পড়ি যায় লোকে গড়াগড়ি
স্ত্রী পুরুষে ধূলায় লুটায় ॥
চান্দ বলে প্রজাগণ কেন কান্দ অকারণ
যে করিমু শুন কহি কথা।
যত ডিঙ্গা ডুবাইছে সকলে লইব পাছে
সে কানীর লাগ পাই যথা ॥

এই প্রবোধবাক্যে যখন কেহ শান্ত হইল না, তখন চাঁদ কঠোর হইলেন। তাঁহার পরম শত্রু যে এই দুর্বলতায় উল্লসিত হইবে, তাই তিনি আদেশ দিলেন,—

যে কান্দে আমার এথা তাহার মুড়িব মাথা
দেশে রাখি তারে নাহি কাজ।
কাতর হইলুঁ জানি হাসিবেক লঘু কানী
সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ ॥

মনসামঙ্গলের আর একজন বিখ্যাত কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। তিনি পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিত্বশক্তির নিদর্শনে ও করুণরস বর্ণনায় তাঁহার মনসামঙ্গলখানি উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। কবি লখীন্দরের সর্পদংশন-দৃশ্যের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।—

পুষ্পপান দিয়া দেবী পাঠাইল তারে।
বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হইল ভঙ্গ॥
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে॥

এই সব কবি ব্যতীত বাংলার বিভিন্ন অংশে মনসামঙ্গলের বহু কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দিনাজপুরের জগজ্জীবন ঘোষাল, বগুড়ার জীবন মৈত্র, বীরভূমের বিষ্ণুপাল, শ্রীহট্টের ষষ্ঠীবর দত্ত, চট্টগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল

মনসার ন্যায় মঙ্গলচণ্ডীও লৌকিক দেবী। ইনি আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের দেবতা। পরে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের সময় ইনি বৌদ্ধ শক্তি-দেবীতে পরিণত হন। বৌদ্ধ প্রভাবের অবসানে

ইনি হিন্দুদের দেবতায় রূপান্তরিত হইয়া পুরাণে শিবের পত্নীরূপে স্থান লাভ করেন।

চণ্ডীমঙ্গলে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুইটি কাহিনী আছে,—একটি কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, অপরটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী।

কালকেতু ব্যাধের কাহিনী এইরূপ :—ইন্দ্র শিবপূজা করিবেন, তাই পুত্র নীলাম্বরকে ফুল তুলিবার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, স্বর্গের বাগানে একটিও ফুল নাই। দেবী চণ্ডী মর্তে নিজের পূজা প্রচারের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। নীলাম্বর স্বর্গ ত্যাগ করিয়া অবশেষে ফুলের সন্ধানে মর্তলোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে এক ব্যাধ হরিণের পিছনে তাড়া করিয়া ছুটিতেছিল। তাহাই দেখিতে দেখিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। অবশেষে ফুল লইয়া নীলাম্বব স্বর্গে ফিরিল। চণ্ডী মায়াবলে কীটের রূপ ধরিয়া ফুলের পাপড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলেন। পূজাকালে কীটরূপিণী চণ্ডী শিবের মাথায় দংশন করিলেন। বেদনাতুর শিব ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্পসংগ্রহকারী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন,—'মর্তে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' চণ্ডীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। পৃথিবীতে নীলাম্বর ধর্মকেতু নামে এক ব্যাধের পুত্র কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার স্ত্রী ছায়া জন্মগ্রহণ করিল সঞ্জয়কেতু নামে এক ব্যাধের কন্যা ফুল্লরারূপে। কালকেতুর এগার বৎসর বয়সে ফুল্লরার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। পিতার মৃত্যুর পর কালকেতু ফুল্লরাকে লইয়া সংসার আরম্ভ করিল।

কালকেতু ছেলেবেলা হইতেই খুব বলিষ্ঠ ; শক্তি ও সাহস তাহার অসীম। শিকারে তাহার অদ্ভুত দক্ষতা। কিন্তু এই ব্যাধ-দম্পতীর দিন কাটে বড় দুঃখে। শিকারই তাহাদের একমাত্র জীবিকা। কালকেতু প্রতিদিন বন হইতে শিকার করিয়া আনে, আর সেই পশু-মাংসের পসরা সাজাইয়া ফুল্লরা ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া আসে।

কেহ বা সেই মাংস কড়ি দিয়া কেনে, কেহ বা কেনে ক্ষুদ-কুঁড়া দিয়া। যেদিন শিকার মেলে না বা মাংস বিক্রী হয় না, সেদিন তাহাদের উপবাস। এমনি করিয়া তাহাদের সংসার চলিতেছিল।

এদিকে বনের পশুবা কালকেতুর অত্যাচারে নির্মূল হইবার পথে চলিয়াছে। তাহারা এই বিপদে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল। দেবী তাহাদিগকে অভয় দিলেন। একদিন চণ্ডী মায়া বিস্তার করিয়া বনের পশুদিগকে আড়াল করিয়া রাখিলেন। সেদিন আব কালকেতুব শিকার জুটিল না। পরদিনও বনে কালকেতু শিকারের উপযুক্ত জন্তু দেখিল না, কেবল ফিরিবার পথে একটি স্বর্ণবর্ণের গোধিকাকে দেখিতে পাইল। তাহাকেই পুড়াইয়া খাইবার জন্য বাঁধিয়া বাড়িতে লইয়া আসিল। বাড়ি আসিয়া গোধিকাকে পুড়াইয়া ছাল ছাড়াইতে বলিয়া সে বাসি মাংসেব পসরা লইয়া বাজারে চলিয়া গেল। এদিকে ঘরে চাল বাড়ন্ত। ফুল্লরা তাহার সখীর বাড়ি হইতে ক্ষুদ উধার করিয়া আনিয়া দেখে এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে গোধিকাটি ছিল, সেখানে এক পরমাসুন্দরী নারী দাঁড়াইয়া আছে। বিস্মিত ফুল্লরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তাহার স্বামী তাহাকে এখানে আনিয়াছে এবং সে এখানেই থাকিবে। ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এই দুঃখের জীবনে স্বামিপ্রেমই ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। এই রমণীকে নিরস্ত করিবার জন্য সে তাহার বার মাসের দুঃখের বর্ণনা শুনাইল, সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি সতীর দৃষ্টান্ত দিল। কিন্তু যখন দেখিল, রমণী কিছুতেই ঘর ছাড়িবে না, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর খোঁজে হাটের পথে ছুটিল। কালকেতু এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ শুনিয়া বাড়ি-আসিয়া দেখিল, সত্যই এক অপূর্বসুন্দরী রমণী। সেও অপরিচিতাকে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু সে কিছুতেই ঘর ছাড়িবে না। কালকেতু তখন ধনুকে তীর জুড়িল। এবার চণ্ডী দেবী নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। সে মূর্তি দেখিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা বিস্ময় ও ভয়ে স্তব্ধ

হইয়া রহিল। দেবী কালকেতুকে প্রচুর ধন দিলেন ও জঙ্গল কাটাইয়া নগর পত্তন করিতে বলিলেন। দেবীর কৃপায় কালকেতুর দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচিল। সে রাজা হইয়া বসিল।

ভাঁড়ুদত্ত নামে এক ধূর্তপ্রকৃতির লোক কালকেতুর নিকট মন্ত্রিপদ চাহিয়া অপমানিত ও বিতাড়িত হইল। এই আক্রোশে সে কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ করিল। তাহাব প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হইল। কালকেতু কারাগারে চণ্ডীর স্তব করিতে লাগিল। স্বপ্নে চণ্ডী রাজাকে কালকেতুর মুক্তি ও তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। কালকেতু পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হইল। দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়া শাপান্তে কালকেতু ও ফুল্লরা স্বর্গে চলিয়া গেল।

ধনপতি সদাগরের কাহিনী এইরূপ :—ধনপতি সদাগর উজানি নগরের এক ধনশালী বণিক। তাহার স্ত্রী লহনা নিঃসন্তান। তাই ধনপতি লহনার খুড়তুত ভগিনী খুল্লনাকে বিবাহ করিল। বিবাহের পরই রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌড়নগরে যাইতে হইল। প্রথমে লহনা খুল্লনাকে ভগিনীর মতই গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দাসী দুর্বলার কুপরামর্শে তাহার উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করিল। ধনপতির জাল চিঠি দেখাইয়া তাহাকে ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করিল আর আলুনে খুদের জাউ খাইতে দিয়া ঢেঁকিশালে শুইবার ব্যবস্থা করিল। ছাগল চরাইবার সময় একদিন একটা ছাগল হারাইয়া গেল। খুল্লনা মহা দুর্ভাবনায় পড়িল। শেষে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিল ও হারানো ছাগল ফিরিয়া পাইল। সেই অবধি খুল্লনা চণ্ডীর ভক্ত হইয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। ধনপতি শীঘ্রই বাড়ি ফিরিল। খুল্লনার দুঃখের দিন শেষ হইল। কিছুদিনের মধ্যেই আবার রাজার আদেশে ধনপতিকে

সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলের জন্য চণ্ডীর ঘট পূজা করিতেছিল। শিবের উপাসক ধনপতি যাত্রাকালে তাহাই দেখিয়া চণ্ডীকে ডাইনী দেবতা বলিয়া তাঁহার ঘট লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। চণ্ডী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। সমুদ্রে ধনপতির ছয় ডিঙা ডুবিল। একমাত্র মধুকর ডিঙা লইয়া বহু কষ্টে ধনপতি সিংহলে পৌঁছিল। সিংহলের কাছাকাছি আসিয়া সমুদ্রে ধনপতি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। সমুদ্রের মধ্যে এক পদ্মবন, তাহাতে এক পদ্মের উপর বসিয়া এক রূপসী নারী একবার হাতী গিলিতেছে, আবার উগরাইয়া ফেলিতেছে। সিংহলের রাজার নিকট ধনপতি এই 'কমলে কামিনী' দেখার গল্প করিল। রাজা বলিলেন, তাঁহাকে এই দৃশ্য দেখাইতে হইবে, নচেৎ ধনপতিকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। ধনপতি স্বীকার করিল, কিন্তু রাজাকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। সবই তো দেবীর ছলনা। ধনপতি সিংহলের কারাগারে বন্দী হইয়া রহিল।

এদিকে দেশে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম শ্রীমন্ত। সে বড় হইয়া দীর্ঘদিন পিতাকে না দেখিয়া ডিঙা সাজাইয়া পিতার সন্ধানে বাহির হইল। সিংহলের নিকটে আসিয়া সেও কমলে কামিনী দেখিল এবং রাজার নিকট তাহা প্রকাশ করিল। রাজা বলিলেন, 'যদি ইহা দেখাইতে পার, তবে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দিব, না হইলে প্রাণদণ্ড হইবে।' কিন্তু শ্রীমন্ত রাজাকে তাহা দেখাইতে পারিল না। তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। রাজার লোকেরা তাহাকে মশানে লইয়া গেল। তখন শ্রীমন্ত চণ্ডী দেবীর স্তব করিতে লাগিল। চণ্ডী মশানে আবির্ভূত হইয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। তাঁহার ভূত-প্রেতের দল রাজার সৈন্যদের পরাস্ত করিল। চণ্ডীর কৃপায় রাজা কমলে কামিনী মূর্তি দেখিতে পাইলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত মুক্তিলাভ করিল। শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহল-রাজকন্যার বিবাহ হইল। পিতাপুত্রে বাড়ি ফিরিবার পথে ধনপতি তাহার ছয় ডিঙা ফিরিয়া পাইল। চণ্ডীর কৃপা ও আশীর্বাদে

ধনপতি ও শ্রীমন্তের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য সম্ভব হইল। চণ্ডীর মাহাত্ম্য সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হইল।

মাণিকদত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। তাঁহার কাব্যের প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গে কোন দেবদেবীর বন্দনা নাই; কেবল ধর্মঠাকুর হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালী-সমাজে হিন্দু-পুরাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, বৌদ্ধপ্রভাবের সময়, তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব মাণিক দত্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে গৌড় অঞ্চলে বা মালদহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কবির একান্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অনেক চিত্রকে জীবন্ত করিয়াছে। লহনা খুল্লনাকে ধনপতির জাল পত্র দেখাইলে খুল্লনা তাহা অবিশ্বাস করিল, তখন—

খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া॥
চুলেতে ধরিয়া গালেতে দিল চড়।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকের উপর॥
কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।
পরিবারে আজ্ঞা দিল খুঞিঞার বসন॥

মাণিক দত্তের পরেই চণ্ডীমঙ্গলের আর একজন কবি দ্বিজ মাধব বা মাধব আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইহার কাব্য রচনা শেষ করেন। ইনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের নাম 'সারদা-চরিত' বা 'সারদামঙ্গল'। সমাজের নানা শ্রেণীর নরনারীর চরিত্র সম্বন্ধে কবির বিশেষ জ্ঞান ছিল। অনাড়ম্বর ভাষায় কবি তাহাদের চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাস্তব জীবনবোধের যথেষ্ট পরিচয় আছে। খুল্লনার উপর লহনার নির্যাতনের বর্ণনা মর্ম স্পর্শ করে।—

খুল্লনা বসিলা ছেলী থুইয়া অজাশালে।
মানের পাতে লহনার ক্ষুদের অন্ন বাড়ে॥

অল্প অন্ন দল ছেছা পোড়া বহুল ।
পাট শাক রান্ধি দিল পাকা কলার মূল ॥
ভাঙা নারিকেলে জল দিল সুবদনী ।
ভোজন করিতে বসে খুল্লনা বাণ্যানী ॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কেবল মঙ্গলকাব্যেরই নয়, সকল দিক দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একবারে শেষের দিকে তিনি তাঁহার কাব্যরচনা শেষ করেন। তাঁহার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। তাঁহার উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণ'। কাব্যমধ্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। মানসিংহ যখন বাংলার সুবেদার, তখন মামুদ সরিপ নামে এক ব্যক্তি সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল। সে ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। তাহার অত্যাচারে প্রজারা সব ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। মুকুন্দরামও তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সপরিবারে সাত পুরুষের ভিটা ত্যাগ করিলেন। পথে নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে মেদিনীপুর জেলার আরড়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানকার ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামকে আশ্রয় দেন এবং তাঁহাকে নিজ পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ জমিদারির ভার গ্রহণ করিলে তাঁহারই অনুরোধে কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

মুকুন্দরাম জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, নানা অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। লোকচরিত্র সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তিনি প্রচুর অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভা মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করিয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত, ফুল্লরা প্রভৃতির চরিত্র বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

মুরারি শীল জাতিতে বেনে—সে পোদ্দারি ব্যবসা করে। কালকেতু গিয়াছে তাহার নিকট দেবীদত্ত সোনার আংটি বিক্রয়ের জন্য। মুরারি একবার মাংস লইয়াছিল। তাহার জন্য কালকেতুর নিকট সে দেড়বুড়ি ধারিত। কালকেতুর সাড়া পাইয়াই ধার শোধ করিতে হইবে ভয়ে সে বাড়ির মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিল। তাহার স্ত্রীও এই ধূর্ত মহাজনের উপযুক্ত স্ত্রী। সে আসিয়া বলিল—

ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া,
কালি দিব মাংসের উধার॥
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন্য একভার, একত্র শুধিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥

পাওনাদারকে এড়াইবার চমৎকার কৌশল! তার পর কালকেতু যখন বলিল যে, সে পাওনার তাগিদের জন্য আসে নাই, একটি অঙ্গুরী ভাঙাইতে আসিয়াছে, তখনই খুড়া

ধনের পাইয়া বাস আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেগে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ির থলি
সাপড়ি তরাজু লইয়া হাতে।

আর কালকেতুর সঙ্গে আত্মীয়তার ভান করিয়া অনুযোগ করে,—

বেনে বলে ভাইপো এবে নাই দেখি তো
এ তোর কেমন ব্যবহার।

তার পর আংটিটি পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, উহা খাঁটি সোনার, তখন কালকেতুকে ফাঁকি দিবার জন্য গম্ভীর ভাবে বলিল,—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল॥

ধূর্ত বণিকের চরিত্রটি আমাদের চোখের সম্মুখে যেন ছবির মত ফুটিয়া উঠে।

নীচমনা প্রতারক ও ধূর্ত ভাঁড়ুদত্ত মুকুন্দরামের আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। নূতন গুজরাট নগরে দোকানদারদের উপর অত্যাচার করায় কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে তাড়াইয়া দিল। ভাঁড়ু কালকেতুকে শাসাইয়া গেল,

পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।

ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজকে প্ররোচনা দিয়া কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাইল। কালকেতু পরাজিত হইয়া ধানের ঘরে গিয়া লুকাইলে ভাঁড়ুদত্তের কৌশলেই সে বন্দী হইল। শেষে দেবীর কৃপায় যখন সে মুক্তি পাইয়া সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ধূর্ত ভাঁড়ুদত্ত সর্বাগ্রে কালকেতুর কাছে গিয়া দুঃখ করিতে লাগিল,—

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

সার্থক চরিত্রচিত্রণ ছাড়া মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা সেকালের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের অনেক চিত্র পাই। এই চিত্রগুলি কবি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্যাধ-পত্নী ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-বর্ণনায় সেকালের সমাজের নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের দুঃখ-বেদনা যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে,—

ধীরে-ধীরে কহে রামা যত দুঃখবাণী।
ভাঙা কুঁড়ে ঘর, তালপাতার ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনলসম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥

পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী॥

বাঙালী চিরদিনই ভোজন-রসিক। রন্ধন-শিল্পে বাঙালী নারীর পটুত্ব চিরকালই সমানভাবে বজায় আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে মধ্যযুগের রাঢ়ের নানাবিধ খাদ্য ও রন্ধন-প্রণালীর একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। খুল্লনা একটি ভোজ উপলক্ষে রাঁধিতেছেন,—

বার্তাকু কুমড়া ভাজা কাঁচাকলা দিয়া মাজা
বেসারি পিঠালি ঘন বাঁটি।
ঘৃতে সন্তালিল তথি হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটি॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নট্যাশাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁঠাল বিচী দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক তৈল বাথ্য দৃঢ় পাক
খণ্ডে ফেলে বটিকা ভাজিয়া॥
দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সাঁতলিল মহরীর বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষু রস কই ভাজে গণ্ডা দশ
মরিচাদি দিয়া আদা-রসে॥

মুকুন্দরামের পর দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন ও হরিরাম প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মুকুন্দরামের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের কাব্যে নাই।

ধর্মমঙ্গল

যেমন মনসা ও চণ্ডীর কাহিনী অবলম্বনে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্মঠাকুর নামে এক দেবতার মাহাত্ম্য ও মর্তে তাঁহার পূজা প্রচারের কাহিনী লইয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে।

মনসা ও চণ্ডীর ন্যায় ধর্মঠাকুরও লৌকিক দেবতা। গোড়ায় ইনি ছিলেন এদেশের আদিম আর্যেতর জাতির দেবতা। তার পর তাঁহার উপর বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাব পড়িয়াছে। ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন; তিনি কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, কোথাও সূর্য বলিয়া পূজিত। এই লৌকিক দেবতাটি বর্তমানে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৌরাণিক দেবতার ছদ্মবেশে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্বশ্রেণীর গ্রামবাসীদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের মানভূম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত। এই অঞ্চলের নাম রাঢ়দেশ। ধর্মঠাকুর বিশেষভাবে রাঢ়েরই দেবতা। এই অঞ্চল ছাড়া বাংলার আর কোন অংশে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন নাই এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন পুঁথি বা কবির সন্ধানও অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে রাঢ়ের জাতীয় জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। এইগুলিকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায়।

ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। প্রস্তরখণ্ডেই ধর্মের পূজা হয়। এই ধর্মশিলা কোথাও ডিম্বাকৃতি, আবার কোথাও কচ্ছপের আকৃতি-বিশিষ্ট। কোন কোন স্থানে প্রস্তরখণ্ডের গায়ে পিতলের পেরেক বসানো থাকে—তাহাই ধর্মঠাকুরের চক্ষু বলিয়া পরিচিত। এই শিলারূপী ধর্মঠাকুরগণ পল্লীর বৃক্ষমূলে পড়িয়া থাকেন। কোথাও কোন ভক্ত বৃক্ষসংলগ্ন স্থানে তাঁহার জন্য মাটি বা ইটের মন্দির নির্মাণ

করাইয়া দেন। বর্তমানে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারেও ধর্মশিলা শালগ্রাম শিলার মত বিষ্ণুরূপে নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। ধর্মঠাকুর 'রায়' নামে অভিহিত। এক এক জায়গায় এক এক নামে তিনি পরিচিত, যথা—বাঁকুড়া রায়, কালু রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি।

ধর্মঠাকুর বিশেষভাবে গ্রামবাসীদের মঙ্গলকারী দেবতা। অনাবৃষ্টি হইলে ধর্মঠাকুরের পূজা দিলে সুবৃষ্টি হয়; কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী হইলে তাহা দূরীভূত হয়, কুষ্ঠরোগ হইলে ধর্মঠাকুরের মানসিক পূজা দিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়, বন্ধ্যার পুত্রলাভ হয়, মৃতবৎসার সন্তাননাশ বন্ধ হয়—গ্রামবাসীদের এইসব বদ্ধমূল বিশ্বাস।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি অবশ্যকরণীয় অঙ্গ। ছাগ, বিশেষ করিয়া সাদা রঙের ছাগ, ও পায়রা বলি দেওয়াই বিধি। ডোমজাতির লোকেরাই সাধারণত এই দেবতার পূজারী। তাহাদের উপাধি 'পণ্ডিত'। তাহাদিগকে 'দেয়াসী' অর্থাৎ দেবাংশী বলা হয়। যে-সব গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতই পূজা করে বটে, কিন্তু দেয়াসীরা দেবতার মূল সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক ভাবেই সর্বদা কাজ করিয়া থাকে। এই ধর্মপণ্ডিতগণের উপর জনসাধারণের অসীম শ্রদ্ধা। তাহারা লোকের অসুখ-বিসুখে, কুষ্ঠরোগে, স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতিতে মাদুলী, জলপড়া বা টোট্‌কা ঔষধ দিয়া থাকে।

ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত তিন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়,—নিত্যপূজা, বাৎসরিক পূজা ও মানসিক পূজা। এই মানসিক পূজাকে 'ঘরভরা' বা 'গৃহভরণ' বলে। বাৎসরিক পূজা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ধর্মের গাজন উৎসব হয়। এখন অনেক গ্রামে ধর্মঠাকুর শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হওয়ায় ধর্মের গাজন শিবের চড়ক-গাজনে পরিণত হইয়াছে।

বাংলাদেশে ধর্মপূজা সম্বন্ধে যে-সব গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার দুইটি শ্রেণী আছে। একটিতে আছে সৃষ্টিকাহিনী, ধর্মঠাকুরের জন্ম, তাঁহার প্রথম পূজারী রামাই পণ্ডিতের মাহাত্ম্য ও তাঁহার দ্বারা পূজাপ্রবর্তনের কথা, ধর্মপূজার মন্ত্র ও ছড়া প্রভৃতি; আর এই সঙ্গে আছে ধর্মদেবতার প্রথম দুই উপাসক রাজা হরিশ্চন্দ্র ও সদাভোমের কাহিনী। এইগুলি 'শূন্যপুরাণ' বা 'ধর্মপুরাণ' বলিয়া কথিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে ধর্মদেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ধর্মমঙ্গল কাব্য। লাউসেন-কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া এই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের মত ধর্মমঙ্গলও নাটমন্দিরে বা দেব-মন্দিরের সম্মুখে খোল বা মাদলের বাজনার সঙ্গে গাওয়া হইত। আসরের সামনের অংশে দেবতার ঘট বসানো হইত। সেই ঘটে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গায়ক পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাতে চামর ঢুলাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য গান করিত। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল আটদিন ধরিয়া গাওয়া হইত, ধর্মমঙ্গল গাওয়া হইত বারদিন ধরিয়া।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী এইরূপ: গৌড়রাজের অধীন ত্রিষষ্ঠী-গড়ে কর্ণসেন নামে এক সামন্ত-নৃপতি ছিলেন। গৌড়রাজের শ্যালক মহামদ ছিল প্রধান মন্ত্রী। সে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। তাহার চক্রান্তে রাজার একান্ত অনুগত ও প্রিয় প্রজা সোম ঘোষ কারারুদ্ধ হয়। রাজা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দেন এবং কর্ণসেনের উপরে তাহাকে ত্রিষষ্ঠীগড়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। সোম ঘোষ পুত্র ইছাই ঘোষকে সঙ্গে করিয়া ত্রিষষ্ঠীগড়ে উপস্থিত হইলে কর্ণসেন তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লন।

ত্রিষষ্ঠীগড়ে ইছাই শরীরচর্চা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিক্রমশালী হইয়া উঠিল। শেষে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া নিজেই গড়ের মালিক হইয়া বসিল এবং ঢেকুর নামক স্থান সুরক্ষিত করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে লাগিল। যথাসময়ে গৌড়েশ্বরের কর্মচারী

খাজনা লইতে আসিলে খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। গৌড়েশ্বর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ঢেকুর আক্রমণ করিলেন। ইছাই-এর বীরত্ব ও কৌশলে গৌড়সেনা পরাজিত হইল। কর্ণসেনের ছয়পুত্র যুদ্ধে নিহত হইল, পুত্রবধূরা সহমরণে গেল, এবং রাণী অসহ্য শোকে আত্মহত্যা করিলেন।

কর্ণসেন শোকে ও দুঃখে পাগলের মত হইয়াছেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুনরায় সংসারী করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। তার পর তাঁহাকে ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা করিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে মন্ত্রী মহামদ তাহার ভগিনীর বিবাহ অনুমোদন করিবে না ভাবিয়া রাজা তাহাকে কৌশলে অন্যত্র পাঠাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সে যখন জানিতে পারিল, তখন ভগিনী ও ভগিনীপতির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাদের মুখদর্শন করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

কিছুদিন পরে ভ্রাতার সংবাদ লইবার জন্য যখন রঞ্জা কর্ণসেনকে গৌড়ে পাঠাইল, তখন মহামদ রাজসভায় ভগিনীপতিকে অপমান করিল ও ভগিনীকে সন্তানহীনা বলিয়া গালি দিল। রঞ্জাবতী পুত্র-লাভের জন্য নানা ঔষধ ব্যবহার ও নানা দেবদেবীর নিকট পূজা-মানসিক করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। শেষে ধর্মের নামে 'শালে ভর' দিয়া অর্থাৎ কণ্টকশয্যা গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ধর্মরাজ খুশি হইয়া পুত্রবর দিলেন। ধর্মের কৃপায় পুত্র লাউসেনের জন্ম হইল।

এদিকে মাতুল মহামদ শিশু ভাগিনেয় লাউসেনকে নানা বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় তাহার কোন ক্ষতি হইল না। ক্রমে লাউসেন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন। নিজের শক্তি ও সাহস দেখাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার লাভের আশায় তিনি পিতামাতার অনুমতি লইয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন। পথে মহামদ-প্রেরিত আটজন মল্লকে পরাজিত করিলেন। কামদল

নামক বাঘ ও ভীষণাকৃতি একটি কুমীরকে দমন করিলেন। রাজ-দরবারে মহামদ তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া লাউসেন রাজার নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া দেশে ফিরিলেন।

মহামদ লাউসেনকে আবার নূতন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কামরূপ রাজ্য জয় করিবাব জন্য পাঠাইলেন। লাউসেন কামরূপেব বাজাকে পরাজিত করিলেন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ কবিযা দেশে ফিরিলেন। সিমলার রাজা হরিপালের এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম কানড়া। তাহাকে বিবাহ করিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল গৌড়েশ্বরের। কিন্তু সে বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ করিবে না। সে ছিল দেবীর ভক্ত। দেবী তাহাকে এক লোহার গণ্ডার নির্মাণ করাইয়া দিয়া বলিলেন যে, যে পুরুষ এই গণ্ডারকে এক কোপে দুইখণ্ড করিতে পারিবে, সে-ই হইবে তাহাকে বিবাহ করিবার অধিকারী। গৌড়েশ্বর তাহা পারিলেন না। মহামদেব পরামর্শে লাউসেনকে আনানো হইল। লাউসেন এক কোপে গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। কানড়া তাঁহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গলায বরমাল্য দিল। রাজা নিবাশ হইয়া গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন।

রাজা লাউসেনকে জব্দ করিবার জন্য ইছাই ঘোমেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। ইছাই ঘোষ বিশেষ শক্তিশালী। ইহা জানিয়াও লাউসেন ঢেকুরগড় আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। লাউসেন ধর্মের কৃপাবলে বলীয়ান্। তিনি অবশেষে ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

এবার লাউসেনকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হইল। রাজার আদেশ—লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইবে। এ কাজ না করিতে পারিলে তাহার পিতামাতাকে বধ করা হইবে। লাউসেন এই অসাধ্য সাধনের জন্য তাঁহার ইষ্টদেবতা ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন

হইলেন। ধর্মদেবের পীঠস্থান হাকন্দে গিয়া তিনি কঠোর পূজা আরম্ভ করিলেন। নিজের দেহের মাংস কাটিয়া দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে লাগিলেন। শেষে নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া আহুতি দিতে গেলে ধর্মদেব সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হইল।

এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মন্ত্রী মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিল। কালু ডোমের স্ত্রী লখ্যা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। শেষে রাণী কানড়ার হাতে তাহার পরাজয় ঘটিল। মহামদ পশ্চিমের সূর্যোদয় ব্যাপারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য হরিহর নামক এক বাদ্যকরকে ঘুষ দিয়া বশীভূত করিয়াছিল। কিন্তু হরিহর ধর্মের ভয়ে সত্য কথা প্রকাশ করিল। প্রকাশ্য রাজসভায় মহামদ চরম লজ্জিত ও অপমানিত হইল। নানা দুষ্কর্ম ও অত্যাচারের জন্য ধর্মঠাকুর মহামদের উপর কুপিত হইলেন। তিনি তাহার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইবার অভিসম্পাত দিলেন। মহামদ সর্বাঙ্গব্যাপী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। শেষে দয়ালু লাউসেনের অনুগ্রহে সে এই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিল। তারপর লাউসেন পরম শান্তিতে এবং যশ ও গৌরবের সঙ্গে ময়নাগড়ে রাজত্ব করিয়া যথাসময়ে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। এইভাবে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা মর্তধামে প্রচারিত হইল।

ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম কাব্যরচনা করেন, তাঁহার নাম ময়ূরভট্ট। পরবর্তী কবিরা তাঁহাদের গ্রন্থারম্ভে এই আদিকবির বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল হাকন্দ পুরাণ। ময়ূরভট্টের কোন নির্ভরযোগ্য পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। ময়ূরভট্টের পর খেলারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলি, রূপরাম, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, দ্বিজ প্রভুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু,

হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রামকান্ত রায় প্রভৃতি কবিগণ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে রূপরামের কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহার কাব্য রচিত হয়। রূপরাম সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের নিদর্শনও তাঁহার কাব্যে মিলে। তাঁহার বর্ণনা সবল ও সাবলীল। কাব্যের আরম্ভে যে আত্মবিবরণ ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ আছে, তাহাতে পথিমধ্যে ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের বর্ণন। এইরূপ,—

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥

তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ ডুর ডুর।
আপনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর॥

আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম॥

ঘনরাম চক্রবর্তীই ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার সুবৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তাঁহার কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির অপূর্ব মিলন হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে তিনি অনেক প্রবাদবাক্য ও সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের মর্মার্থ ব্যবহার করিয়া বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—

মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥

সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥

কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে॥

রাঢ়ের তেজস্বিনী নারীর চরিত্রচিত্রণেও কবি বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গলের মত ব্যাপক প্রচার লাভ করে নাই, বা চণ্ডীমঙ্গলের মত কাব্যের ঐশ্বর্যসম্ভারও ইহাতে নাই। ইহা রাঢ়ের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভুত হইয়াছিল এবং সেই দেশেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। ইহাকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপর কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং নাথ-সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভাগবতের কংস-চরিত্রের সঙ্গে মহামদের চরিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। একবার সে কর্ণসেনকে বলিয়াছিল—

দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের চরিত্র প্রায় সকল কবিদের হাতেই সুন্দর ফুটিয়াছে। তাহার বীরত্ব, নির্ভীকতা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, পিতামাতা ও দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, ঔদার্য প্রভৃতিতে সে নায়ক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন মহাকাব্য

রামায়ণ

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের সুপ্রাচীন জাতীয় মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্য সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে লেখা। ইহাদের কাহিনী অবলম্বনে ভারতের নানা প্রান্তে সংস্কৃত ভাষায় কত কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। সর্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাতেও এই সব কাহিনী লইয়া সাহিত্য রচনা করা হইয়াছে। এই দুই কাব্য উচ্চ চারিত্রিক আদর্শ-স্থাপনে ও সুনীতি-শিক্ষায় ভারতের জাতীয় জীবনের উপর গভীর এবং শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মুসলমান আমলে অনেক মুসলমান শাসনকর্তা হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাহাতে ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ বাংলায় প্রচারিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে কৃত্তিবাস ওঝাই প্রথমে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা 'শ্রীরাম-পাঁচালী' কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর বাঙালীর ঘরে ঘরে পঠিত ও পূজিত হইতেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে যেমন আদিকবি বাল্মীকি, বাংলা সাহিত্যেও সেইরূপ আদিকবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত এত জনপ্রিয় ও সমাদৃত কাব্য বাংলায় আর নাই।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের অবিকল অনুবাদ করেন নাই। রামসীতার কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি নূতন কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙালী জাতির ভাবোচ্ছলতা, অন্তরের মাধুর্য, তাহার সরলতা ও দুর্বলতা তাঁহার কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার রাম,

লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, বিভীষণ, মন্দোদরী প্রভৃতি আচরণে ও চিন্তায় খাঁটি বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী জাতির কাব্য এবং কৃত্তিবাস বাঙালীর জাতীয় কবি।

কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ওঝা, মায়ের নাম মালিনী। বার বৎসর বয়সে বিদ্যালাভের জন্য পদ্মা নদী পার হইয়া তিনি উত্তরবঙ্গে গুরুগৃহে গিয়াছিলেন। সেখানে আট বৎসর নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে তখনকার বাংলার রাজধানী গৌড়নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া রাজসম্মান লাভ করিবেন। নানা ছন্দে সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া তিনি রাজার নিকট পাঠ করিলেন। রাজা কৃত্তিবাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন এবং একখানি পাটের চাদর দান করিলেন। তার পর তাঁহাকে বাংলায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিলেন। রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া কবি তাঁহার রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। এই সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

প্রসাদ পাইয়া বাহির হইল রাজার দুয়ায়।
অপূর্বজ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবার॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
বাপমায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥

এই আত্মপরিচয়ে কবি বলিয়াছেন,—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

কিন্তু ইহাতে কবির জন্ম-সনের উল্লেখ নাই। কবি রাজসভার

বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু গৌড়রাজের নাম উল্লেখ করেন নাই। রাজার সভাসদ্‌দের হিন্দু নাম, রাজসভার বর্ণনায় হিন্দু-রাজারই পরিচয়, চন্দনাদির দ্বারা কবির অভ্যর্থনাও হিন্দু-রীতি অনুযায়ী। পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন, এই রাজা দনুজমর্দন-উপাধিধারী রাজা গণেশ। তাঁহার রাজত্বকাল ছিল ১৪১৪-১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ। কৃত্তিবাস ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মাঘ রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালাভের পর সুপণ্ডিত হইয়া তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে রাজদরবারে উপস্থিত হইলে রামায়ণ রচনার আদেশ পান।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অশিক্ষিত পুঁথি-লেখকের হাতে এবং গায়কদের কণ্ঠে ফিরিয়া ফিরিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ-কাব্যের রচনা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ভাষার নিদর্শন আর নাই এবং নূতন বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কৃত্তিবাসের গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এই পরিবর্তনের দ্বারা তাঁহার কাব্য যুগোপযোগী নবরূপ ধারণ করিয়াছে এবং বাঙালী-হৃদয়ের নিকট ইহার আবেদন সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের অনুসরণে পরবর্তী কালে অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, আসামী কবি অনন্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তাঁহার নিবাস ছিল পাবনা জেলার বড়বাড়ী গ্রামে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন রামায়ণ-গায়ক। তাঁহার নিজের রচিত রামায়ণ গান করিবার সময় তিনি নিজেকে সর্বদা অদ্ভুতাচার্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার অদ্ভুতাচার্য উপাধির সৃষ্টি এবং তাঁহার রামায়ণও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ বলিয়া পরিচিত। সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, রঘুবংশ প্রভৃতি হইতে তিনি অনেক কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও অনেক অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। অদ্ভুত রামায়ণ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে বিশেষ

প্রচলিত ছিল। প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাঁহার রচনা বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

তাঁহার আত্মবিবরণীতে তিনি বলিয়াছেন যে সাত বৎসর বয়সে যখন তাঁহার উপনয়ন হয় নাই, তখন রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিলেন।—

মাঘমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণে।
অদ্ভুত হইল নাম সেই সে কারণে॥

মনসামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণ-রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণ-গাথা বা ছড়া ময়মনসিংহ জেলা ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে বিশেষ সমাদৃত। এখনও বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরা এই মহিলা-কবির রামায়ণ গান করিয়া থাকে। চন্দ্রাবতীর রচনা সরল, কবিত্বময়, ও করুণরস-সৃষ্টিতে সার্থক। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন।

কৃত্তিবাসের পরবর্তী রামায়ণকারদের মধ্যে অনন্তই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অনন্তের বাড়ি ছিল আসামে। সেখানে তিনি অনন্তকন্দলী নামে পরিচিত। ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ, ইহার অন্য নাম ছিল রামসরস্বতী। অনন্তের ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও জটিল। তাহাতে আসামী ভাষার প্রভাব প্রবল। অবশ্য তাঁহার আবির্ভাবকালে বাংলা ও আসামী ভাষায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহার রচনার নমুনা এইরূপ,—

রাঘবর ভার্যাতে তোঁহোর ভৈল মন।
তিথাল খাণ্ডাত জিহ্বা ঘর্ষণ দর্শন॥
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস।
সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্বনাষ॥

মহাভারত

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কাশীরাম দাস সত্যই বলিয়াছেন যে, মহাভারতের কাহিনী অমৃতের মতই মধুর এবং অমৃতের মতই মৃত-সঞ্জীবনী। মহাভারতে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের এক উজ্জ্বল চিত্র আছে। উন্নত চরিত্র, বীরত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্মবুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির বহু কাহিনী বর্ণিত আছে মহাভারতে। এইগুলি সমস্ত ভারতবাসীকে উচ্চ আদর্শ, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়াছে এবং তাহাদের জীবন নূতনভাবে গঠিত করিয়াছে। মানুষের ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত প্রসঙ্গেরই অবতারণা আছে ইহার মধ্যে। সেইজন্যই প্রবাদ আছে,—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। কাশীরাম দাস সেই অমৃত-সমান মহাভারতের কাহিনী বাংলায় প্রচার করিয়া বাঙালীকে নবজীবন দান করিয়াছেন।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতের অনুবাদেও বাঙালী কবি অনেক পরিবর্তন, পরিবর্জন ও নূতন সংযোগ করিয়াছেন। বাঙালী কবির হাতে পৌরাণিক চরিত্রগুলি বাঙালী বনিয়া যাওয়ায় মহাভারত বাঙালী-জীবনের কাব্যে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও বাঙালী-জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হইয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। রাজকার্যের অবসরে তিনি মহাভারতের কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা করেন। কবীন্দ্র-উপাধিপ্রাপ্ত পরমেশ্বর দাসকে তিনি অতি সংক্ষেপে মহাভারত রচনার আদেশ দেন। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভারত-কাব্যের নাম 'পাণ্ডববিজয়' বা 'মহাভারত পঞ্চালিকা'। ইহা

'পরাগলী মহাভারত' নামেও পরিচিত। তিনি এইভাবে পরাগল খাঁ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—

লস্কর পরাগল গুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান॥
দানে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী।
কুতূহলে করাইল ভারথ-পাঞ্চালী॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনা সহজ ও সাবলীল। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা এইরূপ,—

পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘশ্যাম অঙ্গ কমললোচন॥
মেঘের বিদ্যুৎ তুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম এ চারি করেত॥
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ॥

পরাগলের পুত্র নসরৎ খাঁ বা ছুটিখাঁও পিতার মত বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হইলে শ্রীকর নন্দীকে দিয়া অশ্বমেধপর্বের বিস্তৃত অনুবাদ করান। এই কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই লিখিত হয়।

আরও অনেক কবি মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক পরিচিত কবি কাশীরাম দাস।

কাশীরাম দাস (বংশ-পদবী অনুসারে 'দেব') সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের কিছু অংশ লিখিয়া কাশীরাম পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে মহাভারত শেষ করিবার জন্য আদেশ দিয়া যান। নন্দরাম সমস্ত পর্বগুলি লিখিয়া শেষ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। শেষ পর্বগুলিতে অন্যান্য লেখকের হাত থাকিতে পারে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীদাসের মহাভারতেও বহু

কবির রচনা মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও এই কাব্যের প্রাণসূত্রটি ছিন্ন হয় নাই এবং ইহার মূলগত ঐক্যও নষ্ট হয় নাই। সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত একটি অভিনব কাব্যসৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

কাশীরাম দাস ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। তাঁহার কাব্যে চৈতন্য-প্রচারিত ভক্তিধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। তাহাতে তাঁহার কাব্যখানি বাঙালীর রস-সংস্কারের অনুকূল হওয়ায় তাহার নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে।

কবির আত্মবিবরণীতে জানা যায় যে, তিনি বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণায় সিঙ্গি গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সিঙ্গিগ্রামের 'কেশে পুকুর' ও 'কাশীর ভিটা' এখনও তাঁহার স্মৃতির পরিচয় বহন করে। তিনি মেদিনীপুর জেলার আউসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার মহাভারত রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই তাঁহার কাব্য রচিত হয়।

কবি শ্রীমধুসূদন কাশীরাম দাস সম্বন্ধে একটি কবিতায় বলিয়াছেন যে, ভগীরথ যেমন তপস্যা করিয়া মহাদেবের জটার মধ্য হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়া মর্তে প্রবাহিত করান এবং সগরের সন্তানদের উদ্ধার করিয়া সুনির্মল বারিধারায় জনগণের তৃষ্ণা নিবারণ করেন, কাশীরামও সেইরূপ মহাভারতের ভাবমন্দাকিনীকে সংস্কৃতের জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলায় প্রবাহিত করান এবং সেই পুণ্যধারায় বাঙালীর তৃষ্ণা নিবারণ করেন। কবির এ মন্তব্য সর্বতোভাবে সত্য।

লক্ষ্যভেদের পূর্বে কাশীরাম অর্জুনের রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

শ্রীচৈতন্য

এই মহাপুরুষের আবির্ভাব বাংলাদেশের পক্ষে, বাঙালী জাতি পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙালীর ধর্মে সাহিত্যে, সমাজ-ব্যবস্থায় ও সংস্কৃতি-চেতনায় এই অসাধারণ মানুষটি ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও আদর্শ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের এক সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলায় তাঁহার পূর্বনিবাস ছাড়িয়া তিনি স্থায়িভাবে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাঁহাকে গৌরাঙ্গ, গৌর বা গোরা বলিয়া ডাকিত।

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ-অলংকারাদি শাস্ত্র পড়িয়া সমাজে বিশিষ্ট পণ্ডিত-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তিনি নিজেই টোল খুলিয়া ব্যাকরণশাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। নিমাইএর বড় ভাই বিশ্বরূপ যৌবনেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতা জগন্নাথেরও মৃত্যু হইয়াছিল। নিমাই এবার বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন।

দেশে তাঁহার ভূসম্পত্তি ও আত্মীয়স্বজন ছিল। তিনি বিধবা মাতা শচী দেবী ও নবপরিণীতা বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়াকে গৃহে রাখিয়া পূর্ববঙ্গে দেশের উদ্দেশে নৌকাযোগে ভ্রমণে বাহির হইলেন। বৎসরাধিক কাল পরে গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে।

এই আকস্মিক আঘাতে তাঁহার হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। মাতা পুত্রকে পুনরায় সংসার-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য তাঁহারই নির্বাচিতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু পূর্বের মত সংসারে আর তাঁহার মন বসিল না।

এইবার গৌরাঙ্গের জীবনে আসিল এক অচিন্তনীয় পরিবর্তন। পিতৃকৃত্যের জন্য তিনি গয়াতীর্থে গিয়াছিলেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানকালে তিনি হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবাবেগ অনুভব করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল অনুভূতি তাঁহার দেহমন বিকল করিয়া দিল। সেই সময় এক ভক্তসন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার দেখা। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর এক নূতন মানুষ হইয়া তিনি নবদ্বীপে ফিরিলেন। সংসারের কোনও কার্যে আর মন নাই। টোল উঠাইয়া দিলেন। সারাদিন কেবল হরিনামকীর্তনে মাতিয়া রহিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে তিনি সারারাত্রি ধরিয়া হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। শেষে দিনের বেলায় নবদ্বীপের পথে পথে সদলবলে কীর্তন করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। নবদ্বীপ হরিভক্তির বন্যায় প্লাবিত হইয়া গেল। ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলেই এক অভিনব ভক্তিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেকালে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-বিচার, উচ্চনীচ-বিচার, হিন্দু-মুসলমান জাতিবিচার প্রভৃতিতে সমাজ ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন। যে ঈশ্বরের ভক্ত ও প্রেমিক সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ভগবৎ-প্রেমে কোনও জাতি-কুল বা সামাজিক মর্যাদাবিচার নাই। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ'। এই হরিনামে উন্মত্ত যুবকের ভাববিহ্বল প্রচারে সকল শ্রেণীর লোকের প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব ভক্তির আবেগ প্রবাহিত হইল। সমাজের কৃত্রিম ভেদের মূল একেবারে শিথিল হইয়া গেল। তথাকথিত নিম্নশ্রেণী এক নূতন মানবীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

নবতম মূল্যবোধ ও চিরাভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে বাঙালীর জীবনে সংঘটিত হইল এক রক্তহীন বিপ্লব।

এই প্রেমধর্মপ্রচারে নিমাইএর প্রধান সহায়ক ছিলেন নিত্যানন্দ। ইঁহার বাড়ী ছিল উত্তর রাঢে। এক অবধূত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া শেষে নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যের সঙ্গে যোগ দেন। আর একজন ছিলেন হরিদাস। তিনি জাতিতে মুসলমান। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মেরই মূল জানিয়া চৈতন্যের সঙ্গে হরিনামকীর্তনে যোগ দেন। মুসলমান শাসনকর্তার কোন নির্যাতনই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। ইঁহাদের প্রভাবে কত পাপী, কত দুষ্কর্মকারী ভগবদ্‌ভক্তে পরিণত হইয়াছে। জগাই-মাধাই তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত।

ক্রমে নিমাইএর ভক্তিভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। কাটোয়ায় গিয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মায়ের আর্তনাদ, পত্নীর চোখের জল, কিছুই তাঁহার পথরোধ করিতে পারিল না। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া মায়ের অনুমতি লইয়া পুরীধামে চলিয়া গেলেন। তার পর ছয়বৎসর ধরিয়া তাঁহার ভ্রমণ চলিল দক্ষিণভারত গুজরাট, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, গৌড় প্রভৃতি স্থানে। তাঁহার অভিনব প্রেমধর্ম চারিদিকে প্রচারিত হইল। সকলে তাঁহার অলৌকিকভাব-দর্শনে মুগ্ধ হইল। সর্বত্র তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। বাংলার সুলতান হোসেন শাহের দুইজন মন্ত্রী সনাতন 'সাকর মল্লিক' ও রূপ 'দবিরখাস' সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নানাশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত এই দুই ভাই চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্দাবনে গিয়া প্রেমধর্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী রামানন্দ রায় প্রভৃতি তাঁহার

গুণমুগ্ধ ভক্তশিষ্যে পরিণত হইলেন। জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি পুরীধামেই কাটাইয়াছিলেন। শেষের দিকে তিনি নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক ভাব ও অপূর্ব তন্ময়তা দেখিয়া লোকে ভগবৎপ্রেম যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিল। তিনি তাঁহার ধর্মের জন্য কোনও প্রচার করেন নাই। তাঁহার জীবনই ছিল তাঁহার বাণী।—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীধামে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য-জীবনী

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁহার লোকোত্তর জীবন ও অনুপম কার্যাবলী অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনী-কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের জনচিত্তে তিনি এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে এই মহাপুরুষকে লোকে অবতার বলিয়া দেবতার আসনে বসাইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায়। ইহা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টবাসী মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের প্রথম অনুগত সহচরদের অন্যতম। এই গ্রন্থ চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই লেখা হইয়াছিল। ইহার পর পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর সংস্কৃতভাষায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার পর স্বরূপ গোস্বামী চৈতন্যের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কতগুলি শ্লোক রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লিখিত হয়।

সংস্কৃতে লেখা এইসব গ্রন্থ হইতে, পরবর্তী সময়ে যাঁহারা চৈতন্য-জীবনী রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যের সর্বপ্রথম জীবনী-গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গী নিত্যানন্দের আদেশে তিনি এই জীবনীগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবত তিনখণ্ডে বিভক্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও গয়াগমন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত আছে; মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত এবং অন্ত্যখণ্ডে তাঁহার নীলাচলে অবস্থানকালীন ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তি-তদ্গত কবি বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের উপর দেবত্ব আরোপ করিলেও, চৈতন্যের বাল্য-কৈশোর-লীলা তিনি ঐতিহাসিকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি তৎকালীন নবদ্বীপের তথা বাংলার সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বাস্তবতথ্যপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের রচনা সরল ও সাবলীল।—

ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥···
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে ॥

চৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বরূপ অদ্বৈতাচার্যের টোলে পড়িতে গিয়াছেন। মাতা শচী দেবী নিমাইকে পাঠাইয়াছেন খাইবার জন্য দাদাকে ডাকিয়া আনিতে। তাহার বর্ণনা এইরূপ,—

রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে ॥

মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায় ।
আইসেন অগ্রজেরে নিবার ছলায় ॥···
দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর ॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী ।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি ॥

নিমাই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অল্পবয়সেই ব্যাকরণে বিশেষ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। মুরারি গুপ্ত টোলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অগ্রসর ছাত্র বলিয়া টোলের অন্যান্য ছাত্রেরা নিমাইএর নিকট হইতে পাঠ বুঝিয়া লইত, কিন্তু মুরারি গুপ্ত লইত না। তাই নিমাই তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন,—

প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড় ।
লতা-পাতা দিয়া গিয়া নাড়ী কর দৃঢ় ॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষম-অবধি ।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথে ॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা ।
ঘরে যাও তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া ॥

চৈতন্যভাগবতের পরে শ্রীচৈতন্যের উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল মুরারি গুপ্তের কড়চা ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত অবলম্বনে রচিত। চৈতন্যের অলৌকিক জীবন সম্বন্ধে লোকপ্রিয় পাঁচালী কাব্য রচনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লোচন ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত রচয়িতা। তাঁহার এই জীবনীকাব্য রচনালালিত্য ও কবিত্বসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে লিখিত হয়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের সমসাময়িক কালেই রচিত। এই গ্রন্থখানিও পাঁচালী কাব্য বা পালাগানের ভঙ্গীতে লেখা। সাধারণ শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করাই লেখকের আদর্শ ছিল। সেইজন্য তিনি চৈতন্য-জীবনের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পালাগানের আকারে নয়টি খণ্ডে বিভক্ত,—আদিখণ্ড, নদীয়া-খণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকল-খণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। জয়ানন্দের গ্রন্থে উল্লিখিত চৈতন্যজীবনের একটি ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চৈতন্যের কোনও জীবনীতেই তাঁহার কি-ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। চৈতন্যের তিরোভাব-কাহিনী সকলেই গোপন করিয়া গিয়াছেন, জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে রথযাত্রার সময় নাচিতে নাচিতে চৈতন্যের বাঁ পায়ে ইটের আঘাত লাগে। তাহার বেদনায় তিনি শয্যাগত হন এবং কয়েকদিন পরে মারা যান। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

গোবিন্দদাসের কড়চা নামে একখানা চৈতন্যজীবনী অনেকে বাংলা ভাষায় লিখিত চৈতন্যের প্রাচীনতম চরিত-গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ইহার রচয়িতা গোবিন্দদাস কর্মকার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে চৈতন্যদেবের ভৃত্যরূপে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি চৈতন্যদেব সম্পর্কে বিবরণগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর মত উচ্ছ্বাসহীন পদ্যাকারে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা হইতে চৈতন্যজীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আবার এইসব তথ্যের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ পোষণ করেন এবং এগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন না।

চৈতন্যজীবনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। ইহা আদি মধ্য ও অন্ত্য লীলায় বিভক্ত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের শেষজীবনের কাহিনীর বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। কৃষ্ণদাস সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। শেষজীবনে চৈতন্যদেবের ভাবতন্ময় অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ তিনি

দিয়াছেন। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের পরবর্তী কালে কৃষ্ণদাস কবি-রাজের এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

কৃষ্ণদাস ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। চৈতন্যচরিতামৃতে কাব্য, অলংকার, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে অজস্র উদ্ধৃতি তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেয়। এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভক্তিরস মিশ্রিত ছিল। চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি তিনিই সুচারুরূপে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত একাধারে চৈতন্য-জীবনের ইতিহাস, বৈষ্ণবধর্মের রসবিশ্লেষণ, চৈতন্যলীলার মর্মবিচার এবং ভক্তের হৃদয়াবেগের কাব্য-রূপায়ণ। ইহা বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলার বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যচরিতামৃতের গৌরব ও মর্যাদা অসীম। ইহা তাহাদের বেদস্বরূপ।

বৃন্দাবনের ভক্ত গোস্বামীদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থশেষের বক্তব্যে কবির আন্তরিক বিনয় ও তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়,—

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥······
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥

পঞ্চম অধ্যায়

গীতিসাহিত্য

বৈষ্ণব পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দীপ্ত মুকুটমণি বৈষ্ণব পদাবলী। বাঙালী-চিত্তে ইহার আবেদন এখনও পর্যন্ত প্রবল ও অম্লান রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকে অবলম্বন করিয়া যে গীতিকাব্য রচিত হইয়াছিল মূলে তাহাই বৈষ্ণব পদাবলী নামে খ্যাত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় এইরূপ রাধাকৃষ্ণের লীলা-সংগীত রচিত হইত। জয়দেব তাঁহার 'গীতগোবিন্দ'-এ 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী' রচনা করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনও ঐরূপ পদের সমষ্টি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় রাধাকৃষ্ণের বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। মিথিলা তখন পূর্বভারতের বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। বাঙালী ছাত্রেরা সেখানে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যাইত। বাঙালীর কাছে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী চিরদিনই প্রিয়। এই ছাত্রেরা সেই শ্রুতিমধুর পদগুলি মুখস্থ করিয়া বা লিখিয়া আনিয়া বাংলা দেশে প্রচার করিত। এই পদগুলি বাংলায় খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। বাঙালী কবিগণ এই অনুপ্রেরণায় বিদ্যাপতির শ্রুতিমধুর ভাষার অনুকরণে পদ রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা খাঁটি মৈথিলী হইল না। ইহা বাংলা মৈথিলী ও পশ্চিমা হিন্দীর মিশ্রণে এক কৃত্রিম ভাষা-রূপে পরিণত হইল। এই ভাষাই 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত। এই ব্রজবুলি ভাষায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও চৈতন্যলীলার শত শত পদ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল হইতেই এই ব্রজবুলিতে পদ রচিত হইতে আরম্ভ হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ধর্মতত্ত্ব থাকিলেও ইহা আমাদের হৃদয়ের

সামগ্রী হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা মানুষের চিরন্তন স্নেহ-প্রেমের অনুভূতির মধ্যেই ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অশেষ প্রীতি, পতির উপর পত্নীর সর্বত্যাগী প্রেমের মধ্য দিয়াই ভগবানকে উপলব্ধি করার কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে ভালবাসে, ভৃত্য যেমন প্রভুকে ভালবাসে ও ভক্তি করে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে সেইভাবে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি। এই ভালবাসা যদি সত্যই আন্তরিক হয়, তবে ভগবান আমাদের নিকট ঐভাবেই ধরা দিবেন। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পাঁচভাবে তাঁহারা ভগবানের উপাসনার কথা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবের ভগবান কৃষ্ণ। তিনি দ্বিভুজমুরলীধর, বনমালাশোভিত—বৃন্দাবনে লীলাকারী। তিনি যশোদার স্নেহের দুলাল, শ্রীদাম-সুদামের প্রাণের সখা, রাধিকার প্রণয়ী। ভগবানের এই পুত্র-রূপে, সখা-রূপে, প্রণয়ি-রূপে লীলা বৈষ্ণবপদাবলীর কবিরা তাঁহাদের পদে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের এই পদরচনা ও পদকীর্তন তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গ হইলেও এই ভাবানুভূতি মানব-হৃদয়ের শাশ্বত বস্তু। তাই কালপ্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব নষ্ট হয় নাই। ইহারা একটি ধর্মসম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া সর্বজনীন ও সর্বকালীন হইয়া পড়িয়াছে।

রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে চৈতন্যদেবের পূর্বে পদাবলী রচিত হইলেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এই বিষয়ে পদরচনায় বান ডাকিয়াছিল। ইহাতে বাংলা সাহিত্যের একটা গৌরবময় অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাভাবের পূর্ণ প্রতিমূর্তি। রাধার ভাবতন্ময়তা-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শ ছিলেন শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে সর্বদা তন্ময় থাকিতেন। নীল মেঘে, ময়ূরময়ূরীর নীল কণ্ঠে, নীল তমালতরুতে শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তির সাদৃশ্য দেখিয়া

চৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত হইয়াছেন—এইরূপ বর্ণনা আমরা তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে পাই। পদাবলীতেও রাধিকার এইরূপ চিত্র দেখি—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।

—চণ্ডীদাস

এক দীঠ ধরি ময়ূর -ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীখনে।

—চণ্ডীদাস

মনে হয়, চৈতন্যদেবের জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই পদকর্তাগণ রাধিকার এমন প্রেমতন্ময় চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের স্বর্গীয়-মহিমা-মণ্ডিত জীবন ও অলৌকিক কার্যাবলী দেখিয়া লোকে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিল। ভক্তগণ তাঁহাকে রাধাভাবে ভাবিতে এবং রাধার কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বিশ্বাস করিল। তখন রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদের সঙ্গে গৌরাঙ্গলীলারও পদ রচিত হইল। সেই পদগুলিও বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গৌরাঙ্গলীলা না বুঝিলে রাধাকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য বুঝা যাইবে না, সেই জন্য গৌরাঙ্গলীলার পদকে ভূমিকারূপে গ্রহণ করিয়াছেন পদকর্তাগণ। এইপদগুলির সাধারণ নাম 'গৌরচন্দ্রিকা'।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অবদান বাংলাসাহিত্যকে এক অভিনব ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, বাসুদেব ঘোষ, নরোত্তম দাস, শশিশেখর, জগদানন্দ, অনন্ত দাস, বংশীবদন, যদুনন্দন দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি।

চৈতন্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। ইনি আমাদের পূর্বে উল্লিখিত বড়ু চণ্ডীদাস নন।

চণ্ডীদাসের পদ মধুর, ভাব-গভীর ও মর্মস্পর্শী। ইহার ভাষা সহজ,

রচনা সরল। ইহাতে অলংকারের বাহুল্য নাই, কেবল অনুভূতির তীব্রতায় ও গভীরতায় অন্তরে যেন দাগ কাটিয়া রাখিয়া যায়। কৃষ্ণ নাম শুনিয়া রাধার দেহমনের অবস্থা চণ্ডীদাস বর্ণনা করিতেছেন,—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

কৃষ্ণপ্রেমে রাধার মর্মবেদনা ও ব্যাকুলতার চিত্র কবি এইভাবে আঁকিতেছেন,—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।

তার পর

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

চণ্ডীদাসের রাধার এইরূপ ধ্যানতন্ময়, তপস্বিনী উপাসিকার মূর্তি। জ্ঞানদাস অনেকটা চণ্ডীদাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার

পদও সহজ সাবলীল এবং ভাবের অকৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে মনোহর। জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার ব্যাকুলতা এই পদটিতে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

জ্ঞানদাসের আর একটি বিখ্যাত পদে রাধার আক্ষেপ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥

জ্ঞানদাসের রচনা চণ্ডীদাসেরই মত প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী দেখিয়া সকলে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের 'কবি-সন্তান' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে,—

চণ্ডীদাস-রসপদ্মে অলি জ্ঞানদাস।
মকরন্দময় ছন্দে যাঁহার প্রকাশ॥

বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম বিখ্যাত কবি গোবিন্দদাস কবিরাজকে ঐরূপ বিদ্যাপতির 'কবি-সন্তান' বলা যায়,—

ভণয়তি রাস রস বিদ্যাপতি শূর।
কবি গোবিন্দদাস রসপুর॥

গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে অভিহিত করিয়াছেন কবি বল্লভদাস,—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥

মিথিলার রাজ-সভাকবি বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যযুগের পূর্বেই বাংলায় বিশেষ আদৃত ছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেবও ইঁহার পদেব রসাস্বাদন করিয়াছেন। ইনি মিথিলার কবি হইলেও বাঙালী ইহাকে বাংলার কবি করিয়া লইয়াছিল। ইঁহার ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দ, অলংকার-প্রয়োগ-কৌশল প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া বাঙালী কবিরা বহু পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার পদাবলী এখন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাপতির রাধা-বিরহেব পদগুলি পদাবলী-সাহিত্যের স্মরণীয় অংশ। রাধার বর্ষাকালীন বিরহের একটি পদ এইরূপ,—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ.ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥······
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

বিদ্যাপতির আর একটি বিখ্যাত পদে রাধার আক্ষেপ ব্যক্ত হইতেছে,—

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিবর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে ॥

লালিত্যময় ব্রজবুলি পদসন্নিবেশে, ঝংকারময় ছন্দের বৈচিত্র্যে, নিপুণ অলংকারপ্রয়োগে গোবিন্দদাস যথার্থই বিদ্যাপতির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

গোবিন্দদাস কবিরাজ আনুমানিক ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়ে সমসাময়িক এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

গোবিন্দদাসের অভিসার ও গৌরচন্দ্রিকার পদ সর্বোৎকৃষ্ট। একটি সুপরিচিত অভিসারের পদ এইরূপ,—

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূরতম পন্থ- গমনে ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
মণি কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

গোবিন্দদাস এই পদটিতে গৌরাঙ্গদেবের অপূর্ব ভাববিহ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় বলরাম দাসের কয়েকটি পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি পদে কৃষ্ণের গোষ্ঠগমন-কালে যশোদার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে,—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥

বাসুদেব ঘোষের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলিও অতি সুন্দর। তাঁহার একটি পদে শিশু গৌরাঙ্গের লুকোচুরি খেলার চিত্রটি কেমন চমৎকার ফুটিয়াছে,—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা ॥

শাক্তপদাবলী

'শাক্তপদাবলী' এই নামটি আসিয়াছে বৈষ্ণব-পদাবলীরই অনুকরণে। বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যেমন হৃদয়াবেগ-প্রধান ভক্তিরসধারা মিশ্রিত, শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও সেইরূপ ধর্ম-তত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিরস মিশ্রিত করিবার প্রয়াস আছে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলী-রচনার গতি অব্যাহত ছিল। ক্রমে সে গতি রুদ্ধ হইয়া গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঐ গতিস্রোত এক ভিন্নপ্রকার রচনায় আত্মপ্রকাশ করিল। শক্তিদেবী শ্যামা বা উমাকে আশ্রয় করিয়া একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গানের উদ্ভব হইল। তাহাকেই বলা হয় শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা কর্ষিত ভূমিতেই শাক্তপদাবলীর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বর্ধিত হইল। শাক্তপদাবলীতে ভক্তিবাদের ভিত্তিতে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শক্তিপূজা বাংলা দেশে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শক্তি অর্থে শিবের পত্নী,—তিনি চণ্ডী, দুর্গা, গৌরী, কালী, অন্নপূর্ণা, শ্যামা প্রভৃতি নামে অভিহিত। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে,—অন্নদামঙ্গল ও কালিকামঙ্গলেও দেবীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি স্বতন্ত্র ধরনের রচনা। শাক্ত পদাবলী খণ্ড খণ্ড পদ বা গানের সমষ্টি। শাক্ত পদাবলীর দুইটি ধারা। একটির অবলম্বন কালী বা শ্যামা। এই ধারার সংগীতকে শ্যামাসংগীত বলা হয়। ইহাতে আধ্যাত্মিক সাধনার কথা আছে। অপর ধারায় দেবী গিরিরাজপত্নী মেনকার কন্যা উমা-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই উমাকে কেন্দ্র করিয়া যে গান রচিত, তাহাকে আগমনী ও বিজয়া গান বলা হয়। এই সব গানে কন্যা উমার জন্য গিরিজায়া মেনকার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ও বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

রামপ্রসাদ শাক্তপদাবলীর আদিকবি। তাঁহার রচিত শ্যামাসংগীত এবং আগমনী ও বিজয়াসংগীত বাংলা গীতিসাহিত্যে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করে। এই ভক্তিরসোজ্জ্বল গানগুলি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল যে রামপ্রসাদের পরেও একশত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া অনেক কবি এ বিষয়ে অজস্র গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওয়ান রঘুনাথ, কবিওয়ালা রাম বসু, পাঁচালীকার দাশরথি রায় প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগমনী ও বিজয়া গান দাশরথি রায়ের হাতে একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। রামপ্রসাদের গান ও তাঁহাব গানের বিশিষ্ট সুরটির প্রভাব এখনও বাঙালী-সমাজে অক্ষুণ্ণই আছে।

রামপ্রসাদ সেন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট বা হালিশহর গ্রামে এক বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। তাঁহার বংশে পূর্ব হইতেই শক্তি-সাধনা প্রচলিত ছিল। তিনিও ছেলেবেলা হইতে শক্তির উপাসনা আরম্ভ করেন। তাঁহার ভক্তি ও সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং কালী কন্যারূপে তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এইরূপ শোনা যায়। কালীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিতে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তি ও ভাবুকতার বিকাশ হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ এক ধনী জমিদারেব সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন। কালীমাতার একনিষ্ঠ ভক্তকবি ভক্তির আবেগে আত্মহারা হইয়া হিসাবের খাতায় গান লিখিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার মনিব খাতায় একটি গানের অংশ লেখা দেখেন,—

আমায় দে মা তবিলদারী,
আমি নেমকহারাম নই শংকরী॥

হিসাবের খাতায় এইরূপ উচ্চভাবপূর্ণ শ্যামাসংগীত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া জমিদার তাঁহার ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কবি চাকুরি ছাড়িয়া শেষজীবনে কালী-সাধনায় এবং শ্যামা ও উমা-সংগীত-রচনায় মগ্ন থাকেন। ক্রমে নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দেন এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীকে তিনি স্নেহময়ী জননী-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। শাক্ত-সাধক সাধারণত মায়ের ভয়ংকরী মূর্তিরই উপাসক, কিন্তু রামপ্রসাদের কাছে মা সন্তানস্নেহাতুরা, মঙ্গলকারিণী, মধুরহাসিনী দেবী। তিনি আবদেরে ছেলের মত মায়ের উপর স্নেহের দাবী জানাইয়াছেন, তাঁহার উপর মান-অভিমান করিয়াছেন; এমন কি, ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু আদুরে, আবদেরে ছেলে যেমন জানে, মা ছাড়া তাহার আপনার-জন আর কেহই নাই, রামপ্রসাদও তেমনি অগাধ বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তির সঙ্গে মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। জীবনে নানা দুঃখবেদনায় জর্জ্জরিত হইয়াও তিনি মায়ের চরণ ছাড়েন নাই,—

ভূতলে থাকিয়া মাগো
করলে আমায় লোহা পেটা;
তবু আমি কালী বলে ডাকি
সাবাস আমার বুকের পাটা।

সংসার-বিষে জ্বলি যত
দুর্গা দুর্গা বলি তত।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই!
দুখে দুখে জনম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি তাই!
সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই॥

রামপ্রসাদ অনেক তত্ত্বকথাকে সহজ, সরল ভাষায় এবং সকলের পরিচিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে কাব্যরূপ দিয়াছেন তাঁহার শ্যামাসংগীতে। জীবন সামান্য কয়েকদিনের জন্য, এই সময়ের মধ্যেই সাধন-ভজন করিয়া জীবনকে প্রকৃতভাবে সার্থক করিতে হইবে—এই ভাবটি ক্ষেতে ফসল ফলাইবার আয়োজনের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইয়া চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার একটি গানে।—

মন, তুমি কৃষি-কাজ জান না!
এমন মানব-জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।

শাক্ত পদাবলীর অন্য অংশ আগমনী-বিজয়া-গান উমাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইলেও বাঙালী-ঘরের একটি বাস্তব অনুভূতি ইহার মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। সেইজন্য বাঙালীর হৃদয়ে এই গানগুলির আবেদন গভীর।

গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমার বিবাহ হইয়াছে শিবের সঙ্গে। ধনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা পড়িয়াছেন বৃদ্ধ ভিখারীর হাতে। শিব দরিদ্র, তাহার উপর অসংযতস্বভাব। নানা অভাবের সংসারে কতকগুলি ছেলেপিলে লইয়া উমার আর দুঃখের শেষ নাই। জননী মেনকার দিন কাটে দুর্ভাবনায়; তাঁহার স্নেহের দুলালী কি করিয়া ভিখারী স্বামীর ঘর করিতেছেন এই চিন্তায় তাঁহার রাত্রে ঘুম আসে না। কখনও পাষাণ স্বামীকে অমন পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের জন্য দোষারোপ করেন, কখনও কন্যার প্রতি অভিমান করেন। শরৎকালের এক রাত্রিশেষে মেনকা স্বপ্নে উমার দুঃখদুর্দশার চিত্র দেখিলেন। তখন

রাণী অস্থির হইয়া কন্যাকে পিতৃগৃহে আনিবার জন্য স্বামীর নিকট কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন,—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা আমাব কত কেঁদেছে।

আবার স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, শরৎকাল আসিয়াছে এবং উমারও পিতৃগৃহে আসিবার সময় হইয়াছে,—

সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি,
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী?
শবতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়,
যাও যাও গিরি, আন গো উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই!

তার পর শারদ-সপ্তমী-প্রাতে পুরবাসীরা রাণীকে উমার আসার সংবাদ দিল,—

পুববাসী বলে—উমাব মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই!
কেঁদে রাণী বলে—আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।

তার পর কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মেনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন,—

কেমন করে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল মা তাই।

চিতা-ভস্ম মাখি অঙ্গে
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই ॥

তার পর তিনদিনের মিলন-উৎসব শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। নবমীর রাত্রেই মায়ের প্রাণে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনার ছায়া পড়ে,—মনে হয়, এই রাত্রি প্রভাত না হইলেই হয়,—

ওরে ও নবমী নিশি
না হইও রে অবসান !
তুমি অস্তে গেলে নিশি
অস্তে যাবে উমাশশী
হিমালয় আঁধার করে।
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে !
উদিলে নির্দয়-রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

কিন্তু তবুও সে রাত্রি প্রভাত হইল। বিজয়ার দিন উপস্থিত। কন্যাকে বিদায় দিতেই হইবে। বিদায়-বেলায় মায়ের দুঃসহ বেদনা আর বাঁধন মানে না,—

কাল এসে আজ উমা আমার যেতে চায় !
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে, উমাধনে
মা হয়ে দিব বিদায় !

আগমনী ও বিজয়া সংগীতের পটভূমিতে যে ধর্মীয় কাহিনীটুকু আছে, তাহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। বাঙালী কল্পনা করে যে, শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় উমা তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে

আসেন, তার পর আবার দশমীর দিন পতিগৃহে চলিয়া যান। দুর্গার পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষ্যেই এই শারদীয়-উৎসব। শ্যামা-সংগীতে দেবীর মাতৃমূর্তি, আগমনী ও বিজয়াসংগীতে কন্যামূর্তি। কিন্তু ইহার জন্য এই গানগুলির বৈশিষ্ট্য নয়। এই গানগুলির সঙ্গে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের একটা গভীর যোগসূত্র আছে।

এক সময় বাঙালী মাতাপিতা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ দিয়া গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করিতেন। এই শিশুকন্যাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পতিগৃহে পাঠাইয়া মাতা সর্বদা শঙ্কাকুল থাকিতেন। সন্তানের জন্য বিচ্ছেদব্যথাও অনুভব করিতেন। তার পর কৌলীন্যপ্রথার দৌরাত্ম্যে দেশের কত উমা যে অপাত্রে পড়িত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। অভাগিনী মায়ের কন্যার জন্য অসীম স্নেহব্যাকুলতা ও নিরুদ্ধ অশ্রুধারা হৃদয়ের অন্তস্তলে পুঞ্জিত হইয়া থাকিত। তাই মাতা কন্যাকে কাছে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল, কাছে পাইলে এত আনন্দিত, এবং বিদায় দিতে এত শোকাকুল। বাঙালী-মাতৃহৃদয়ের এই ব্যাকুলতা ও বেদনা আগমনী ও বিজয়া গানের শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে। ইহার সুরে মাতৃহৃদয়ের কান্নার সুরই বাজিতেছে। সেইজন্যই এই গানগুলি বাঙালীর চিত্ত প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের অনুশীলন

ইউরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গদ্য

সকল দেশের সাহিত্যের মত বাংলাসাহিত্যেও প্রথমে পদ্যের একাধিপত্য ছিল। চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত সাহিত্যই পদ্যে রচিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের যাহা নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা চিঠিপত্র, খত-দলীল ও বৈষ্ণবদের ধর্মশিক্ষার জন্য ভাঙা ভাঙা গদ্যে লিখিত ছোট ছোট 'কড়চা' বই। ইহাদের বাহিরে কোনও একটি বিষয় অবলম্বনে সম্পূর্ণ গদ্যে প্রথম বই লিখিত হয় ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা। তাঁহাদের রচনা যেরূপই হউক, তাঁহাদেরই হাতে গদ্য প্রথম একটা রূপ পাইয়াছে। খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীগণের যতই গরজ থাক না কেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টাতেই যে বাংলা গদ্যের জন্ম হইয়াছে, একথা প্রত্যেক বাঙালীই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে।

ইউরোপ হইতে বণিক্‌গণ প্রথমে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলা দেশে আসে। বণিক্-সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্তুগীজরাই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করে এবং নানা স্থানে বাণিজ্য-কুঠী নির্মাণ করে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকগণও এদেশে উপস্থিত হন। বাংলার নানাস্থানে খ্রীষ্টধর্মের গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্তুগীজ খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই এদেশের ভাষা শিখিয়া লইয়া এদেশের ভাষাতেই ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পুস্তক 'ব্রাহ্মণ-রোমান

ক্যাথলিক সংবাদ'। ইহার রচয়িতা দোম্ আন্তোনিও। ইনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। মগ-দস্যুরা ইঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। একজন পর্তুগীজ পাদরী টাকা দিয়া তাঁহাকে দস্যুদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। শেষে তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া ঐ নাম দেন এবং খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রে তাঁহাকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকগণের প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই পুস্তক হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি জনৈক ব্রাহ্মণ ও একজন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মযাজকের কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। ভাষার একটু নমুনা এইরূপ,—

> রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ, তাহান ভাই লকন, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুদ করিলেন, বালিরে মারি তাহান স্ত্রী সোগিবেরে দিলেন, সে বালির ভাই, তাহারে রাজখণ্ড দিলেন; বিস্তর রাখ্যস বধ করিলেন; কুম্ভকর্ণ বধিলেন, ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, প্রসাতে (পশ্চাতে) রাবণ বধিয়া সীতারে আনিলেন।

ইহার পর পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকদের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। ইহার রচয়িতা মানোএল-দা-আস্সুম্প্সাম্। ইনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালে পর্তুগীজ গীর্জার পাদ্রী ছিলেন। এই পুস্তকে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টধর্মের ও তাহার অনুষ্ঠানাদির মহিমা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহার রচনায় ভাওয়াল অঞ্চলের ভাষার প্রভাব আছে। অনেক স্থানে তিনি পর্তুগীজ ভাষার বাক্য-রচনা-রীতিও অনুসরণ করিয়াছেন। আরবী-ফারসী শব্দেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এই সব ত্রুটিতে তাঁহার ভাষা অনেক স্থলে দুর্বোধ্য হইয়াছে। আন্তোনিওর লেখার সাধুভাষার ধাঁচটি তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনার নিদর্শন এইরূপ,—

> খ্রিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল; লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তারোয়াল খসিয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত সে আরো এক চোট দিল, সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রেরে মাফ চাহিলা কহিল। ঠাকুর, পরাজয় হইয়াছি আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর, তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন।

এই দুইখানি বইই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহারাই বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। মানোএল পর্তুগীজ ভাষায় একখানা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এবং বাংলা-পর্তুগীজ অভিধানও সংকলন করেন। তাঁহার এই ব্যাকরণখানি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের শাসনভার ইংরেজদের হাতে আসে। তখন রাজকার্য চালাইবার জন্য কোম্পানির আইন সমূহের বাংলা অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদের দ্বারাও সদ্যোজাত বাংলা গদ্যের কিছুটা পুষ্টি হয়। এই সময় কোনও কোনও অনুবাদের ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় আইনের মুখবন্ধ এইরূপ,—

> শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট মর্য্যদা ও নানাবিধ দ্রব্য জন্মান ও প্রস্তুত করণের কারণ যে সকল সামিগ্রী চাহি তাহার উৎপত্য ভূমি হইতেই হয়।

ইংরেজের আমলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইংরেজ ধর্মপ্রচারকগণ বাংলায় আসেন ও শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন। এইটিই হয় বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ বাংলা

গদ্যের ব্যাপক অনুশীলন আরম্ভ করেন। পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারায় যদি বাংলা গদ্যের জন্ম হয়, তবে সেই অতি-দুর্বল, সদ্যোজাত শিশুর লালনপালন ও সাধ্যমত পুষ্টিসাধন করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ। বাংলা গদ্যের অনুশীলনে তাঁহারাই প্রকৃত প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চার করেন।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান কর্মী ছিলেন চারিজন—জন টমাস, উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যান। ইহাদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উৎসাহী কর্মী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। শ্রীরামপুর মিশনের সর্বপ্রথম কাজ ছিল সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করা। তার পর বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও বাংলা-ইংরেজী অভিধানও রচিত হয়। এই সব ছাড়াও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতও তাঁহারা প্রথম ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। এই শ্রীরামপুর মিশন হইতেই সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক স্তরে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ড হইতে নবাগত ইংরেজ কর্মচারী-দিগকে দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা দিবার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলা গদ্যের পক্ষে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই কলেজের বাংলা বিভাগের নানামুখী প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য অনেকটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্মপ্রচার এবং শাসননীতিসংক্রান্ত ব্যবস্থা—উভয় ব্যাপারেই ইংরেজ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে।

কিন্তু তাহার অপ্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত শুভজনক। এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন উইলিয়াম কেরী। ইতিমধ্যে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁহার নাম 'বাংলা-জানা ইংরেজ' বলিয়া শাসক-মহলে সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেরীর অধীনে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,—অন্যান্য সহকারী ছিলেন রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কেরী ও তাঁহার সহকর্মীরা বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কেরী পূর্বেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' নামে দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। কথোপকথনে নানা শ্রেণীর বাঙালীর সামাজিক, পারিবারিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন আছে। ইতিহাসমালায় সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভোজপ্রবন্ধ, হিতোপদেশ প্রভৃতির গল্প ও কয়েকটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে গল্প সংকলিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'হিতোপদেশ', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে পুস্তক রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। ইহাতে সংস্কৃত অলংকার, ব্যাকরণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির সারমর্ম ও বিভিন্ন রচনারীতির পরিচায়ক নানা গল্প আছে। এই বইখানি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের, হিন্দু কলেজের, হুগলী কলেজের ও পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে বহুদিন নির্দিষ্ট ছিল। রামরাম বসু রচনা করেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'লিপিমালা' নামে দুইটি বই। রামরাম বসু ছিলেন কেরী সাহেবের মুন্সী এবং তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' কেবল পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই নয়, বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যরচনা বলিয়াও উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া এ যুগের গদ্যরচনা-প্রসঙ্গে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', চণ্ডীচরণ মুন্সীর

'তোতা ইতিহাস', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রভৃতি পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকগণের বাংলা গদ্যের কয়েকটি সহজ নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল—

> তোমরা কয় যা। আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে। কেমন যায়ে যায়ে ভাব আছে, কি কালের মত। আহা ঠাকুরাণী, আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক-বুদ্ধিও করে না। (কথোপকথন—কেরী)

> মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে তাহার নাম সতী দক্ষ মহাব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র শিব তাহার জামাতা বটে কিন্তু তিনি অনাদি কত কোটি ব্রহ্ম ইহার আজ্ঞাবহ। (লিপিমালা—রামরাম বসু)

> দণ্ডকারণ্যে প্রাচীন নদীতীরে বহু কালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। (প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)

রামমোহন রায়

রামমোহন রায় সকল দিক দিয়া বাংলায় আধুনিক যুগের প্রবর্তক। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা—এই কয়টি ভাষার গভীর জ্ঞান, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, অসাধারণ প্রতিভা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব লইয়া বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ মানসিক মুক্তির জন্য রামমোহন রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। একদিকে খ্রীষ্টান পাদরীগণের সঙ্গে, অপর দিকে মুসলমান মৌলভীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। একেশ্বর উপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম। দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন, সামাজিক কুসংস্কার নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, জাতির অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা ও মুক্তিকামনার জাগরণ প্রভৃতি বহুমুখী কার্যে দেশের নানা সম্প্রদায়ের

সঙ্গে তাঁহাকে প্রচুর যুক্তিতর্ক করিতে হইয়াছিল। এই যুক্তিতর্কের অধিকাংশেরই বাহন ছিল বাংলা গদ্য। সদ্যোজাত দুর্বল বাংলা ভাষা-শিশুকে তিনি নূতন বলে বলীয়ান করিয়া সর্বপ্রকার ভাব-প্রকাশের সার্থক বাহনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই সে যুগে বাংলা গদ্যের ব্যাপক অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের প্রকৃত স্রষ্টা।

তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি বুঝিতেন। তাঁহার 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' তিনি বাংলা ভাষার রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বাংলা গদ্যের একটি সহজ, সরল, সংস্কৃত-ফারসী-নিরপেক্ষ নিজস্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন-বিষয়ক ছোট বড় ত্রিশখানি গদ্যরচনা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বেদান্ত-গ্রন্থ', 'বেদান্তসার' ইত্যাদি মৌলিক রচনা।

সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ে তাঁহার রচনার একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

> অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহাদের বাটিতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামমোহন বাংলা গদ্যের সহজ, সরল ও সর্বপ্রকার ভাবের বাহনরূপে যে ধারার প্রবর্তন করেন, বিদ্যাসাগরের হাতে তাহা শিল্প-শ্রীমণ্ডিত হয়। তিনিই প্রথম শ্বাসবায়ুর উত্থান-পতন অনুসারে বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেন। তাহাতে বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত একটা তাল বা ছন্দ ধরা পড়িল এবং ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি লাভ করিল। বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগরই সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাংলা সাধুভাষায় গদ্যের তিনিই স্রষ্টা। তিনি 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যান-মঞ্জরী', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলি তাঁহার মৌলিক রচনা নয়। তবে এগুলি ঠিক অনুবাদও নয়। সংস্কৃত, ইংরেজী বা হিন্দী পুস্তক হইতে ইহাদের উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। 'কথামালা', 'আখ্যান-মঞ্জরী' প্রভৃতিতে বিদ্যাসাগর অনলঙ্কৃত, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, আবার 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা'য় ধ্বনিমুখর, লালিত্যময় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভাবানুযায়ী ভাষাকে সুন্দর ও সহজবোধ্য করিয়া ব্যবহার করিবার কৌশলেই তাঁহার গদ্য সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের এই সংস্কৃতবহুল সাধুভাষা পরবর্তী সময়ে অনেকেই অনুকরণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সাধুভাষার নিদর্শন এইরূপ,—

> এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ-সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর সংস্কৃতশব্দবহুল, সুললিত প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার প্রচলন হয়। কিন্তু ইহার ফলে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ কথ্যভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙালীর কাছে এই ভাষা অত্যন্ত কঠিন ও দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন ভাষাকে সহজ, সরল ও সর্বজনবোধগম্য করিবার জন্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার সংস্কার সাধনে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা কথ্যভাষা ও সাহিত্যের সাধুভাষার মধ্যে দূরত্ব দূর করিয়া সাধারণ-মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগরী সংস্কৃতঘেঁষা ভাষার সহিত সাধারণ কথিত ভাষার বহুল মিশ্রণ ঘটাইলেন। ইহাতে বাংলা গদ্যরচনার এক নূতন দিক উন্মোচিত হইল—এক নূতন আদর্শ স্থাপিত হইল।

এই নব্যভাষা-আন্দোলনের পুরোহিত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্যারীচাঁদের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' কথ্যভাষায় লিখিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। তিনি রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই জানানো হইয়াছিল,—'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।' ইহা ছাড়া তিনি আরও কয়েকখানি পুস্তক ও একখানি জীবনী রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য বই 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। পুস্তকখানির কাহিনী বাস্তব এবং

চরিত্রগুলিও জীবন্ত উজ্জ্বল। শব্দের মধ্যে যেখানেই তিনি সাধু বা সংস্কৃতগন্ধী শব্দ পাইয়াছেন তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ভাষা যাহাতে সর্বজনবোধগম্য হয় সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কথ্য ভাষারও গদ্যরীতি যে এত সাবলীল এবং বেগবান্ হইতে পারে, ইহা পূর্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। তাঁহার গদ্যরীতির একটু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

> সুখের রাত্রি দেখিতে দেখিতে যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবিয়া থাকে তখন রাত্রি অতি বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্তু পোহাই পোহাইতে পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত হইতে না হইতে ঠক চাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

ভাষার শুধু সাবলীলতাই নয়, চলিত গদ্যের ভিতরে কৌতুক রস পরিবেষণেও টেকচাঁদ অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক,—

> রবিবারে কুঠিওয়ালা বড় ঢিলে দেন, হচ্ছে হবে, খাচ্ছি খাব, বলিয়া অনেক বেলায় আহার করেন। তাহার পর কেহ বা বড়ে টেপেন কেহ তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন। কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মলাভ ভাল বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বা বই পড়েন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের এই নতুন গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালী ভাষা নামে পরিচিত।

অক্ষয় কুমার দত্ত

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার দত্তের অবদান। অক্ষয়কুমার ছিলেন পণ্ডিত ও নিরলস জ্ঞান-সাধক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁহার প্রবন্ধগুলি সমৃদ্ধ। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন এবং এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের সকল জ্ঞানী ও গুণিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ ও চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি নানা প্রবন্ধ-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রবন্ধ-পুস্তকটি একখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। এই প্রবন্ধ-পুস্তকটিতে সেইদিনের বাঙালী পাঠক প্রথম দেখিল যে দুরূহ দার্শনিকতত্ত্ব ও গভীর চিন্তাশীল বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তিনি 'চারুপাঠ' নামে তিনভাগে সংকলিত সহজ ও সরল আলোচনাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ-পুস্তক রচনা করেন। 'চারুপাঠ' নানা ইংরেজী গ্রন্থের সার-সংকলনে রচিত। তাঁহার 'পদার্থবিদ্যা' বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম বিজ্ঞান-আলোচনার পুস্তক। ইহা ছাড়া তিনি ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক রচনা করেন। ধর্ম, দর্শন, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বিষয় অবলম্বনে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। রচনায় সর্বদা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, বিস্তৃত অধ্যয়ন, চিন্তার শৃঙ্খলা ও প্রকাশের সুষ্ঠুতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনারীতি দৃঢ়, সাবলীল ও তীক্ষ্ণ যুক্তিতে পরিপূর্ণ। যদিও তাঁহার প্রবন্ধে সাহিত্যরসসৃষ্টির বিশেষ কোন প্রয়াস নাই, তবুও রচনায়

প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ আছে। নিম্নে রচনার একটু নিদর্শন দেওয়া গেল,—

> আহা কি দেখিলাম। এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরবপরিপূর্ণ, লোকাকীর্ণ স্থানও কোথায় দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব পর্বত দর্শন করিলাম। সে পর্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘ সমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ, মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কখনও অনিমেষ ঊর্ধ্ব-নয়নে পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোকসমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করতঃ ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষিত ও স্বজাত্যভিমানী বাঙালীদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। তিনি মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকিলেও ভূদেব ছিলেন দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আচারপ্রণালীর গভীর অনুরাগী। তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান তাঁহার চরিত্রের একটি অন্যতম গুণ। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সমাজ হইতে সুশিক্ষা-গুলি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সমন্বয়মূলক মনোভাবটি তাঁহার প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা দেশের সমাজ-জীবন ও নৈতিক-জীবনের মান উন্নত করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলার যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য, নৈতিক আদর্শ,

ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সংযম-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রচুর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ আছে। 'আচার-প্রবন্ধ', 'পারিবারিক-প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ-প্রবন্ধ', 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থ তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান। ভূদেবের ভাষা সহজ, সরল এবং যুক্তিপূর্ণ। রচনার নিদর্শন এইরূপ,—

> ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত এবং মনকে সর্বতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিয়ত কার্যানুষ্ঠান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ, ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্য-বিধান হওয়ায় দুঃখের হ্রাস, চিত্তের প্রাসর্য এবং বুদ্ধির প্রাথর্য জন্মে। ইহাই ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনোপায়। ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু শাস্ত্রের মত এইরূপ পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও, আমাদিগের দেশে কতকটা ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির পথ এবং নিবৃত্তির পথ দুইটিকে মিলাইয়া যে উভয়-লোক-হিতকারী ব্যবহার-পদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর তেমন যত্নপূর্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহ্যজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্য্যকারী তাহা একেবারে বিস্মৃত।

বঙ্কিমচন্দ্র

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন ঘটে। প্রবন্ধসাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা হইল তাঁহার হাতে। বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞানমূলক আলোচনা এবং যুক্তিতর্কের অবতারণা ছিল এতদিনের প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশরীতির সৌন্দর্য ও রসপরিবেশনের দক্ষতায় বাংলা প্রবন্ধ প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য হইল। প্রবন্ধ-সাহিত্য রস-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্রের সম্পাদক। এই পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। কালক্রমে এই প্রবন্ধগুলি 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি নামের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

রচনার দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, বক্তব্য বিষয় কি-ভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করিলে সে আনন্দের সঙ্গে পাঠ করিবে। সেইজন্য তিনি বিজ্ঞান বা দর্শনের ন্যায় কঠিন, নীরস বিষয়ও কৌতুক ও হাস্যরস সিঞ্চন করিয়া হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। প্রকাশভঙ্গীর প্রতি তাঁহার ছিল সজাগ দৃষ্টি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে এই আনন্দমূলক প্রবন্ধ-রচনা-রীতি অনেক উন্নত ও চিত্তাকর্ষক হয়।

বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ।

'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধপুস্তক। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মের সমালোচনা করিয়াছেন সংযত ও সুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অকৃত্রিম দেশ-প্রেমিক। তিনি দেশের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি সমস্তই হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তাঁহার সেই মানবপ্রীতি ও দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এইখানে বিজ্ঞ সমালোচকের ভূমিকায় বসিয়া সংযত ব্যঙ্গের আবরণে আমাদের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আত্মগতভাবে বিভোর হইয়া তিনি আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন, পাঠক যেন আড়ি পাতিয়া শুনিতেছে। গীতিকবিতার মত এই আত্মগতভাবে প্রবন্ধরচনা-রীতি বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেন। গীতিকাব্যধর্মী রচনার একটু নিদর্শন এইরূপ,—

> বহুকালবিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন?…কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীলসলিলা তরঙ্গিণী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। অনেকদিন আনন্দোত্থিত সংগীতে শুনি নাই, অনেকদিন আনন্দ অনুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্র-মর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাহা নাই।

সমাজে ধনী-দরিদ্রের অশোভন প্রভেদ, ধনিক-শ্রেণীর শোষণ ও দরিদ্রকে নির্যাতন প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্র গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করিতেন। সামাজিক আদর্শে তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। ব্যঙ্গের আবরণে তিনি এই বৈষম্যের কথা বলিয়াছেন তাঁহার 'বিড়াল' প্রবন্ধে,—

> দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমাদের পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর? ছিঃ! কে হইবে?

'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

আজকাল বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ...আমাদের দেশের মঙ্গল হইতেছে।

এই মঙ্গল-ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ, আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধরিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দমজল পান করিতেছে, কিন্তু এখন বাড়ি গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়, সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙা পাথরে রাঙা রাঙা বড় বড় ভাত নুন-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে হইবে—যাইবার সময় কোন জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না!......বল দেখি চশমা-নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে দিগ্‌ভ্রান্ত অন্তঃসারহীন বাঙালীকে তিনি বিদ্রূপের কষাঘাত করিয়াছেন,—

যাঁহার বাক্য মনমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনেল থিয়েটার, তিনিই বাবু। যিনি মিশনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশব-চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে অফুরন্ত দানে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী এবং সুলেখক ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাশীল আলোচনায় বাংলা গদ্যকে তিনি সমৃদ্ধ ও উন্নত করিয়াছেন। বিজ্ঞানের নীরস ও কঠিন বিষয়কে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'চরিত-কথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দকথা', 'বিচিত্র জগৎ', 'জগৎকথা' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপুস্তক। শুধু বিজ্ঞানই নয়, দর্শন সম্পর্কেও তিনি বহু সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় সর্বত্রই গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার রচনা শুধু পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপ্রয়োগে নীরস ও কণ্টকাকীর্ণ করেন নাই। মাঝে মাঝে সরস কৌতুকের অবতারণা করিয়া তিনি পাঠকের চিত্তে আনন্দদানের চেষ্টা করিয়াছেন। গাম্ভীর্য ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকের সংমিশ্রণে তাঁহার রচনাগুলি বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।—

> প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া কহে অমুকের গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে, লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে, পাগল। কেহ বলিবে লোকটা গাঁজা খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি বলিবেন, হইতেও পারে; তবে ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর জীবনী-প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি তাঁহার রচনারীতির অপূর্ব নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'

উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও দেশানুরাগের স্বাক্ষর ইহা বহন করিতেছে।—

> মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাটক ও নাট্যশালা

কবি, পাঁচালী, যাত্রা, টপ, আখড়াই, টপ্পা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজ-রাজত্বের সময় কলিকাতা-অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তখন অনেক ধনশালী শৌখিন ব্যক্তি একশ্রেণীর গানে আমোদ উপভোগ করিতেন। এই গানই 'কবি' গান এবং এই কবি-গান-রচয়িতারা 'কবিওয়ালা' নামে পরিচিত ছিল। মূলে ইহা কৃষ্ণলীলার গান। সখীসংবাদ, বিরহ, রাধার মান ও আক্ষেপ, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতিই গানের বিষয়। কিন্তু এইসব গান হাল্কাভাবে রচিত এবং তরল সুরের ভঙ্গীতে গাওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে পূর্বের পদাবলীর কোন ভাবগভীরতা বা ভক্তিরস ছিল না। এইসব গানের মধ্যে কিছু অশ্লীল রুচির গানও থাকিত। কবিগানের সেই অংশকে 'খেউড়' বলা হইত।

স্টাড়ি

কবি-গানের বৈশিষ্ট্য হইতেছে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। প্রশ্ন ও উত্তরের ('চাপান' ও 'উতর') ভঙ্গীতে দুই দলের মধ্যে গান চলে। যে দলের গানের রচনা ও গাওয়া উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হইত, সেই দলই জয়লাভ করিত। ক্রমে এই গানের প্রচলন কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানের বাহিরে দূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দীর্ঘদিন পল্লীবাংলায় অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইহার আধিপত্য চলে। পল্লী-অঞ্চলে এই কবিগানে দুই দলের কথাকাটাকাটি বা বাদ-প্রতিবাদের অংশই বেশি থাকে। ইহাকে 'তরজা' বা 'তরজ়ার লড়াই' বলা হয়।

প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় কবিওয়ালাদের মুখে মুখে গান রচনা করিয়া গাহিতে হইত বা ছড়া কাটিতে হইত। তাহাদের অনেকের সহজ কবিত্বশক্তি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। গানের রচনাও ছিল অনেকস্থলে শব্দযোজনার কৌশলে চমকপ্রদ। গোঁজলা গুঁই বাংলার প্রাচীনতম কবিওয়ালা। তার পর হরু ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমে নানা রকমের গানের পদ্ধতি কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হয়। এইসব গান নবপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনের বিলাসের একটা অঙ্গ ছিল। পরে এইসব গানের রীতি পল্লী-অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়। তাহাদের মধ্যে নানাধরনের কীর্তন, ঢপ-কীর্তন, মালসী, আখড়াই, টপ্পা, পাঁচালী কবি, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি প্রধান।

'পাঁচালী' একপ্রকারের গান ও আবৃত্তি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি সবই সুরে আবৃত্তি করা হইত। ইহাদিগকেও পাঁচালীকাব্য বলা হয়। পাঁচালীতে একজন মূল গায়ক পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাতে চামর লইয়া ছড়া বা পদ্য আবৃত্তি করিত ও গান করিত। এই গানের সুর কতকটা ঢপ-কীর্তন ও কবিগানের সুরের মত। গায়ক আবৃত্তির সময়ে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করিয়া অনেকটা অভিনয়ের ভঙ্গী করিত। অনেক সময়

এইভাবে হাস্তরসের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিত। পাঁচালীর বিষয়বস্তু প্রধানত ছিল কৃষ্ণলীলা, দেবদেবীর কাহিনী প্রভৃতি। পাঁচালী-রচয়িতা হিসাবে দাশরথি রায় বা 'দাশু রায়' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তাঁহার পাঁচালী বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

'যাত্রা' বাংলা সাহিত্যের কাব্যগীতির শেষ পরিণাম। আমাদের প্রাচীন যুগের অধিকাংশ কাব্যই সুরতালের সঙ্গে গান করা হইত। গানের মাঝে আবৃত্তির ভঙ্গীতে পাঠও হইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাত্রপাত্রী তিনটি—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি। তাহাদের উত্তর-প্রত্যুত্তর গানের মাধ্যমেই ব্যক্ত হইয়াছে। মনে হয় তিনটি চরিত্র যেন গানে অভিনয় করিতেছে। ইহাকে নাটগীত বলা হইত। তার পর মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যেও গান ও আবৃত্তির বিশেষ স্থান ছিল। পাঁচালীর মধ্যেও ঐরূপ গান, আবৃত্তি এবং অভিনয়ের যে খানিকটা ভাব আছে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ধারারই একটি নবরূপ হইল যাত্রা। ইহাতে একটি আখ্যানবস্তু বা 'পালা' আছে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া গান, আবৃত্তি ও অভিনয় দ্বারা দর্শক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহার ধারা অবিকৃতভাবে চলিয়াছিল। পরে ইহার মধ্যে থিয়েটারী ঢঙ প্রবেশ করিয়াছে। গান অনেক পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। হাস্তরস সৃষ্টির জন্য অবান্তর চরিত্রের আমদানিও বন্ধ হইয়াছে। এখন যাত্রা অনেকটা সিন-বিহীন থিয়েটারে পরিণত।

যাত্রা কথাটির অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা বা উৎসব। সেইজন্য ইহার বিষয় ছিল দেব-দেবীর কাহিনী। প্রথমে কৃষ্ণলীলা, কালিয়দমন, চৈতন্যদেবের জীবনী, চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রভৃতি অবলম্বনে যাত্রার পালা গঠিত হয়। পরে বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাহিনীও যাত্রার বিষয় হইয়াছিল। তার পর নানা পৌরাণিক ও

ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনেও যাত্রার পালা রচিত হয়। থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রা নূতন রূপ লাভ করিয়া কবি, পাঁচালী প্রভৃতিকে একেবারে পিছনে ফেলিয়া রাখে। এখন পর্যন্ত থিয়েটার-প্রভাবিত যাত্রা পল্লী-অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়। বারোয়ারী উৎসব, মেলা প্রভৃতিতে যাত্রা এখনও পর্যন্ত জনসাধারণকে নাট্যরসের আস্বাদন দিতেছে। যাত্রার পালা 'গীতাভিনয়' নামে পরিচিত।

'ঢপ' কীর্তনেরই একটা রূপ। ইহাকে ঢপ-কীর্তনও বলা হয়। কীর্তনে যেমন বৈষ্ণব পদকর্তাগণের রচিত রাধাকৃষ্ণলীলার পদ সাজাইয়া একটি পালা রচনা করা হয়, ঢপ-কীর্তনেও সেইরূপ পদ সাজাইয়া একটি পালা রচনা করা হয়। এই পদগুলি বৈষ্ণবপদাবলীর প্রচলিত পদ নয়। ঐসব পদেরই ভাব লইয়া অন্যান্য গীতকার তরল ভঙ্গীতে গান রচনা করেন। কীর্তনের সুরে সেই সব গাওয়া হয়। এই সুরের মধ্যে অবশ্য কবিগানের ও খেমটা গানের প্রভাব আছে। মাঝে মাঝে গায়ক কথকতা করিয়া গানের মর্মবিষয়ে শ্রোতাদিগকে ইঙ্গিত দেন। ঢপ-কীর্তনের প্রধান কবি ও সুরকার ছিলেন যশোহর জেলার মধুসুদন কান। শহর অঞ্চলে মেয়েরাই প্রধানত ঢপ-কীর্তন গাহিত।

'আখড়াই' গানের প্রচলন হয় কলিকাতা-অঞ্চলে। ইহার প্রবর্তক ছিলেন ইংরেজদের প্রধান সাহায্যকারী রাজা নবকৃষ্ণ দেব। আখড়াই গান মূলে ছিল ওস্তাদি-ছাঁচে-ঢালাই গান। ইহা আসরের বৈঠকী গান। গানগুলি ছোট ছোট করিয়া রচিত হইত ও দীর্ঘ সময় ধরিয়া সুরের আলাপ চলিত। তাহার সঙ্গে নানা ঢঙের বাজনা থাকিত। পরে টপ্পা গানের প্রভাব পড়ে এইসব গানের উপর। আখড়াই গানের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর হইত না। যে দল ভাল গাইতে ও ভাল তালে বাজাইতে পারিত, সেই দলেরই জয় হইত।

'টপ্পা' গানের একটা বিশেষ রীতি। 'টপ্পা' হিন্দী শব্দ। ইহার অর্থ সংক্ষিপ্ত। আকারে ছোট এবং বিশেষ সুরে গাওয়া গানকে

টপ্পা-গান বলা হয়। নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত বাংলা টপ্পাগানের আবিষ্কর্তা। তিনি হিন্দী টপ্পাগানকে বাংলা ছাঁদে রূপায়িত করেন। এই গানগুলি একদিন সৌখিন বাঙালী মহলে বিশেষ আদৃত ছিল। নিধুবাবুর একটি গানের অংশ এইরূপ,—

নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা॥

নাটক রচনার সূত্রপাত

বাংলা নাটক আমাদের পুরানো যাত্রা বা পাঁচালী হইতে উৎপন্ন হয় নাই। বাংলা নাটকের গঠনে সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজী নাটকের প্রভাব আছে। প্রথমদিক্‌কার নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব দেখা যায়। পরে ইংরেজী শিক্ষার ও ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রভাবে ক্রমে এই প্রভাব লুপ্ত হয়। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ দিয়াই বাংলা নাটকের আরম্ভ। সংস্কৃত রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর অনুবাদ করেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন নামে এক ব্যক্তি। তার পর 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'রত্নাবলী', 'মালতীমাধব' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

মৌলিক নাট্যরচনার সূত্রপাত হয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রচিত 'কীর্তিবিলাস' নামে নাটক দিয়া। ইহা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী নাটকের আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটক সর্বদাই মিলনান্ত, কিন্তু ইংরেজী নাটক মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত উভয়ই হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই এই প্রথম বাংলা নাটককে বিয়োগান্ত করা হইয়াছে। বাংলা দেশে প্রচলিত একটি কাহিনী অবলম্বনেই এই নাটক রচিত। ইহা পঞ্চাঙ্ক। অঙ্কগুলি দৃশ্যে বিভক্ত। আবার নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতির অবতারণায় সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে ইহার মিলও আছে।

ঐ বৎসরই তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাও ইংরেজী আদর্শে রচিত আর একখানি মৌলিক নাটক। নাট্যকার কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে অর্জুন-কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব নাই। প্রথম দুইখানি নাটকই গদ্যে-পদ্যে রচিত। এই যুগের আর একজন নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ। ইনি শেক্সপীয়ারের নাটক The Merchant of Venice-এর ভাব লইয়া 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' নামে এক নাটক রচনা করেন। 'চারুমুখচিত্তহরা' Romeo and Juliet-এর অনুবাদ। তাঁহার 'কৌরব বিয়োগ' নাটক মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। হরচন্দ্রের রচনা অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং সংস্কৃতনাটকানুযায়ী সূত্রধার, নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি যোগ করা হইয়াছে তাঁহার নাটকে।

নাট্যশালা

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ ভদ্রলোক ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের জন্য কলিকাতায় এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই নাট্যশালায় দুইখানি ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয়। পাশ্চাত্ত্য ধরনে বাংলা নাটকের ইহাই প্রথম অভিনয়। ইহার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। অবশ্য এখানে ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হইত। শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারি করিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়। সেকালের শৌখিন ধনী আশুতোষ দেবের বাড়িতে বাংলা নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র অভিনয় হয়। ইহার পর কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহের

'বিক্রমোর্বশী' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়।

ক্রমে নাটকে ও নাটকের অভিনয়ে বাঙালীর উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া বাগান-বাড়িতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়। এই নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক ও পরে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মহাসমারোহের সঙ্গে অভিনীত হয়। বাংলার নাট্যশালা ও বাংলা নাটকের অভিনয়ের ইতিহাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়।

তাহার পর মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে রামনারায়ণ তর্করত্নের কয়েকখানা নাটক অভিনীত হয়। শোভাবাজার রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'কৃষ্ণকুমারী' এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণের 'নবনাটক' অভিনীত হয়। বহুবাজারের অবৈতনিক নাট্যসমাজে অভিনীত হয় মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', 'সতী', হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটক।

শেষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইলে নাটক সম্বন্ধে বাঙালীর উৎসাহ ও আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হয় এবং নাটক-রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

মাইকেল মধুসূদন

রামনারায়ণের পর যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের আবির্ভাব হয়। মাইকেল শুধুমাত্র কবিই ছিলেন না, তিনি একজন দক্ষ নাট্যকারও ছিলেন। বাংলা নাটককে অনেকটা সম্পূর্ণতা দানের কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। রামনারায়ণের প্রতিভায় বাংলা নাটকের সুরু; মধুপ্রতিভায় তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

মধুসূদন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক তিন শ্রেণীর নাটকই রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাই ইংরেজী আদর্শে নাটক রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন, তবুও সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে এড়াইয়া চলিতে পারেন নাই। নাটকে তিনি অনেক নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার হাতে বাংলা নাটক আধুনিকতার দীক্ষা লাভ করে।

মধুসূদনের সর্বপ্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। কাহিনীটি পৌরাণিক। মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত। ইহাতে তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করেন নাই। ঘটনা, দৃশ্য-সংস্থান ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুসরণ করেন। সে-যুগে নাটকখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং জনসাধারণ ইহাকে শ্রেষ্ঠ নাটক-রূপে বরণ করে। কিন্তু সমালোচকের চক্ষে নাটকখানি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। নাটকটির কাহিনীর মধ্যে ভাব ও কলা-কৌশলের অভাব, ঘটনাস্রোত অতীব মন্থর এবং ঘটনাসমাবেশও ত্রুটিপূর্ণ। এমন কি, সৃষ্ট চরিত্রগুলিও সজীব ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তবুও আধুনিক বাংলা নাটকের পথ-প্রদর্শকরূপে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বিশেষ স্মরণীয়।

মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনী অনুসরণে লিখিত। মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রভাব নাটকটিতে লক্ষ্য করা যায়। রচনা-বিচারে মধুসূদন ইহাতে অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব নাটকে অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে নাটকের নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। মধুসূদন এইবার যেন সে-বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন। এইখানে তিনি ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে সংযত রাখিয়াছেন। 'পদ্মাবতী' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-কীর্তি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। ইহাই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক। টডের রাজস্থান এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'

হইতে তিনি কাহিনী লইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। নাটকীয় গুণে ও লক্ষণে কৃষ্ণকুমারী সার্থকতা লাভ করিয়াছে। চরিত্রগুলি সজীব ও সুন্দর। নায়িকা কৃষ্ণকুমারীর তেজ ও বীরত্ব অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর গতি যেমন দ্রুত, পরিণতিও সেইরূপ স্বাভাবিক। কোথাও অসংলগ্ন ঘটনা অথবা অবান্তর প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই। এই নাটকে মধুসূদন উচ্চতর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক এবং রোমান্টিক ট্র্যাজেডির দাবীও কৃষ্ণকুমারী করিতে পারে। ইহা পুরোপুরি ঐতিহাসিক না হইলেও, ঐতিহাসিক নাটক রচনার পথ-নির্দেশিকা ইহাতে আছে।

প্রহসন-রচনাতেও মধুসূদন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রেঁা' নামে দুইখানি প্রহসন তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় তিনি সে যুগের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গ-সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রেঁা'তে ভণ্ড, দুষ্কৃতকারী, অত্যাচারী প্রাচীন সমাজকে নখরাঘাত করিয়াছেন। দুইখানি প্রহসনই ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দুর্নীতির রঙ্গব্যঙ্গমূলক সার্থক প্রহসন। মধুসূদন যৌবনেই বাঙালী-জীবন হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তবুও দেশের সামাজিক জীবন সম্পর্কে তাঁহার যে সুগভীর পরিচয় ছিল, তাহার স্বাক্ষর পাওয়া যায় প্রহসন দুইখানিতে।

দীনবন্ধু মিত্র

মধুসূদনের পরেই নাট্যরচনার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব ঘটে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও মধুসূদনের নাটক-রচনার সময়কে সাধনার যুগ বলা চলে। এই সময় নাটকের ভাষা,

রচনারীতি, চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনাসমাবেশ প্রভৃতি উন্নত হইয়া একটি পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে। দীনবন্ধুর হাতে এইবার বাংলা নাট্য-সাহিত্য পুষ্ট ও পরিণত হইয়া উঠিল। দীনবন্ধু প্রকৃত নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নাট্যকারের যে বস্তুনিষ্ঠ, ভাবাবেগহীন, সমাজ-সচেতন দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল। আবার পল্লী-বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সহিতও তিনি ছিলেন নিবিড়ভাবে পরিচিত।

তাঁহার প্রথম নাটক 'নীল-দর্পণ' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। নাটকখানি সে-যুগে বাংলা দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার বিষয়-বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সময় ইংরেজ নীলকরগণ বাংলার কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল। কৃষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজ নীলকরগণ তাহাদের জমিতে নীলের চাষ করে, দরিদ্র কৃষকদের বেগার খাটায় এবং প্রতিবাদ করিলে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করে। দীনবন্ধু এই নীলকর-অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত দরিদ্র কৃষকদের একটি জীবন্ত চিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকখানিতে পরিবেষণ করিয়াছেন। নির্যাতিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দরদে লেখক যেন নিজেই অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নির্যাতিত স্বদেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আভাস ইহাতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য নাটকটিকে স্বদেশী নাটকও বলা চলে। কিন্তু বিষয়-বস্তু সাময়িক হইলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে চিরন্তন জীবন-সত্যের যে প্রকাশ আছে তাহাতে নাটকখানি স্থায়ী মূল্য লাভ করিয়াছে। নীল-দর্পণ রঙ্গমঞ্চে অজস্রবার অভিনীত হইয়াছে এবং বিপুল-সংখ্যক দর্শকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

দীনবন্ধুর নাটকে প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা আছে। কিন্তু তাঁহার হাস্যরস খুব মার্জিত নয়। চরিত্রসৃষ্টিতে উচ্চতর চরিত্রগুলি সু-অঙ্কিত হয় নাই, ভদ্রেতর চরিত্রগুলিই জীবন্ত। অনেকে দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও কুরুচির অভিযোগ করেন। ভদ্রেতর

চরিত্রগুলিতে তিনি সংযমের বাঁধ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সব দিক দিয়া বিচার করিলে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন মনে হয়। কারণ তাঁহার নাটকের অনেক চরিত্রই সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক। তাহাদের জন্য সুরুচি ও শালীনতা রক্ষা করিলে চরিত্রগুলি কৃত্রিম ও প্রাণহীন হইত, এমন জীবন্ত ও বাস্তব নাটকের সৃষ্টি হইত না।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক—'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাইবারিক', 'কমলে কামিনী'।

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক। নাটকটি সে যুগের নাগরিক সমাজের একটি বাস্তবচিত্র। প্রতিভাশালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেদিন কিরূপে মদ্যপানে জীবনে সর্বনাশ আনিয়াছিল তাহার কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হইল শিক্ষিত মাতাল নিমচাঁদ। মাতাল হইলেও তাহার চরিত্রে শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপযুক্ত যে ধর্মাধর্মবোধ তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে তিনি প্রাচীন সমাজকে উপহাস করিয়াছেন রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে। প্রহসন রচনায় দীনবন্ধুর দক্ষতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় 'জামাই বারিক' নাটকখানিতে। হাস্যরস এখানে ঘন ও নিবিড় হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। সাধারণ ঘরোয়া হাসি-ঠাট্টা-তামাসা, ছড়া-কাটা আর প্রবাদ-বচনের মধ্য দিয়া যে এককালে বাঙালীর প্রাণরস প্রবাহিত হইত, তাহারই নিখুঁত চিত্র এই নাটকে আছে।

হাস্যরস-পরিবেষণে দীনবন্ধু অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিটি নাটকেই প্রচুর হাস্যরস বর্তমান আছে। এমন কি তাঁহার বিয়োগান্তক নাটক 'নীল-দর্পণে'ও হাস্যরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত। জীবন ও সমাজের অসঙ্গতির মধ্যেই এই হাস্যরসের উৎস। তাঁহার পরিহাসের মধ্যে সর্বদাই একটা স্নিগ্ধতা আছে। কাহাকেও সেই পরিহাস রূঢ় আঘাত হানে না। তাঁহার শ্লেষ-ব্যঙ্গেও

আছে সহানুভূতির ছোঁয়াচ। তবুও রুচিহীনতার অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই।

নীলদর্পণের রচনার একটু নমুনা এইরূপ,—

> তোরাব। ম্যারে বেন ফ্যালায় না, মুই নেমোখারামি কত্তি পারবো না,—যে বড়বাবুর ভগ্গি জান বাঁচেচে, যার হিল্লয বসতি কত্তি নেগেছি, যে বড়বাবু হাল-গোরু বাঁচিয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কথন্নই পারবো না, জান কবুল। (২য় অঙ্ক, ১ গর্ভাঙ্ক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দীনবন্ধু মিত্রের পর আরও কয়েকজন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' নাটক প্রাক্-স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পনৈপুণ্য নাটকগুলিতে বিশেষ কিছুই নাই। মনোমোহন বসু কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রণয়-পরীক্ষা', 'সতী', 'রাজ্যাভিষেক', 'হরিশ্চন্দ্র' বহু অভিনীত। নাটকগুলিতে ভক্তিরসেরই প্রাধান্য। গানের সংখ্যাও অজস্র।

তার পর বিশেষ শক্তিশালী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ আবির্ভূত হন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। তিনি একাধারে শক্তিশালী নাট্যকার ও সুদক্ষ নট। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার সময়ই নাট্যরচনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নাট্যরস-পরিবেষণের আদর্শস্থল রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চে সুষ্ঠু অভিনয়েই নাটকের সাফল্য ও সার্থকতা। বাংলায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার

কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের। তিনি একটি সুদক্ষ নট-গোষ্ঠীর অধিনায়ক ছিলেন। সে-যুগের প্রতিভাদীপ্ত অভিনেতৃগণ—অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তফী, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি —সকলেই গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে একত্র হইয়া ছিলেন। মধুসূদন-দীনবন্ধুর সব নাটকগুলির সফল অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও নাটকে রূপায়িত করিয়া মঞ্চস্থ করেন। অতঃপর মঞ্চসফল উৎকৃষ্ট নাটকের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করিয়া তিনি স্বয়ং নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন।

গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক বিবিধ নাটক রচনা করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি উন্নত প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নাট্য-ধারাকে প্রধানত তিনটি ধারায় বিভক্ত করা চলে। পৌরাণিক নাটক দিয়াই তাঁহার নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত। প্রথম দিকে তিনি কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচনা হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে তাহা রূপায়িত করেন। জাতীয় সংস্কারের প্রেরণা ও অনুভূতি এই নাটকগুলিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জন-চিত্তের উপর ইহার প্রভাব ছিল সে-যুগে অত্যন্ত গভীর। সেইজন্য তিনি জাতীয় কবি নামে পরিচিত ছিলেন। অতঃপর তিনি সামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। মধ্যবিত্তের সমাজ ও নৈতিক জীবনের চিত্র এই নাটকগুলিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেন। শেষ বয়সে গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নাটকের মাধ্যমে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন।

তাঁহার সর্বপ্রথম নাটক 'আনন্দ রহো'। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' ও 'পাণ্ডবগৌরব', সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান', ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী একপ্রকার ছন্দের

তিনি প্রচলন করিয়াছিলেন মধুসূদনের অমিতাক্ষর ছন্দের অনুকরণে। ইহাকে ভাঙা অমিতাক্ষর বা 'গৈরিশ ছন্দ' বলা হয়।

তাঁহার সামাজিক নাটকের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'প্রফুল্ল'। চরিত্র-সৃষ্টি ও নাটকীয় সংঘাতে 'প্রফুল্ল' একটি শক্তিশালী নাটক। পারিবারিক কলহের বিষময় পরিণাম ও মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি দীপ্ত ও সজীব। পণপ্রথার দোষ লইয়া লেখা তাঁহার অপর সামাজিক নাটক 'বলিদান' সে-যুগে প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল; দেশাত্মবোধের উপর ভিত্তি করিয়া নাটকখানি রচিত।

গিরিশ-নাটকের ত্রুটিও উল্লেখযোগ্য। নিছক অভিনয়-সর্বস্বতা সার্থক নাট্য-রসের পরিপন্থী। গিরিশচন্দ্র প্রতিটি নাটকের অভিনয়-সাফল্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সুন্দর সংলাপ, দর্শক-চিত্ত-আকর্ষণকারী চরিত্রসৃষ্টির প্রতি অতিরিক্ত সতর্কতা তাঁহার নাট্য-প্রতিভাকে অনেকখানি ক্ষুন্ন করিয়াছে। নাটকগুলিতে ঘটনা-বন্ধন শ্লথ, প্লটের সুপরিণতির অভাব, অনেক চরিত্রসৃষ্টি রহস্যাচ্ছন্ন ও বৈচিত্র্যহীন, একই ধরনের সংলাপের অতিপ্রয়োগে বাগ্-ভঙ্গি গতানুগতিক। গিরিশচন্দ্র যে প্রথমে নট, পরে নাট্যকার, একথা দর্শক ও পাঠক বিস্মৃত হইতে পারে না।

গৈরিশ-ছন্দের নিদর্শন এইরূপ,—

ভীম। শুন দেবি, সন্ধি নাহি হইবে স্থাপন।
দুর্যোধন করিয়াছে পণ,
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি করিবে প্রদান।
রাখ মতি গোবিন্দের পদে,
একমাত্র পাণ্ডব-ভরসা জনার্দন;
প্রতিজ্ঞা-পূরণ তব অবশ্য হইবে,
সমরে কৌরবকুল হইবে নির্মূল।

(পাণ্ডবগৌরব, ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রতিভার আগমন হয়। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় এতবড় শক্তিশালী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে আর নাই। ইতিহাসের ঘটনা-সংস্থাপনে, চরিত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সৃষ্টিতে, বীররস পরিবেষণে তিনি অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের নাটকের আঙ্গিক ও কৌশলের অনুসরণ তাঁহার প্রায় সব ঐতিহাসিক নাটকেই দেখা যায়। ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা-সম্পন্ন চরিত্রগুলিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নানাভাবের আলোড়ন, দ্বিধাগ্রস্ত মনোবৃত্তি, ভাগ্যের নিকট পরাভব প্রভৃতি আমাদিগকে নাট্যকার শেক্সপীয়ারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকের সংলাপেও তিনি একটি ওজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা কাব্যধর্মী, গতিশীল ও চিত্তাকর্ষক। মানব-মনের গভীর ও মহৎ ভাবগুলি এই ভাষায় শিল্পশ্রীমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার নাটকগুলিতে।

দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনার জাগরণে তাঁহার নাটকগুলি সে যুগে জনচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেশপ্রেমই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকের মুখ্যরস। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক রচনার পথ দেখাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবে সেই পথ প্রশস্ত ও কুসুমাস্তীর্ণ হইল।

'তারাবাঈ' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তার পর 'প্রতাপসিংহ', 'নূরজাহান', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি বহু-অভিনীত ও বহু-প্রশংসিত নাটক-গুলি প্রকাশিত হয়। প্রতিটি নাটকেই জাতীয়তার মন্ত্রগুরু দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার তীব্র জ্বালায় পীড়িত হতভাগ্য মানুষকে নবীন আশার সঞ্জীবনী পান করাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকও রচনা করিয়াছেন।

'পাষাণী', 'সীতা' ও 'ভীষ্ম'—তাঁহার পৌরাণিক নাটক, 'বঙ্গনারী' ও 'পরপারে' তাঁহার সামাজিক নাটক। কিন্তু পৌরাণিক নাটকগুলি অতি-মানবিক ভাবযুক্ত ও ভক্তিরসাশ্রিত না হওয়ায় সাধারণ পাঠক ও দর্শকের নিকট আবেদনহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সামাজিক নাটকে তাঁহার প্রতিভার যথাযোগ্য স্ফুরণ হয় নাই। সেইজন্যই রচনা বৈচিত্র্যহীন ও অতিমাত্রায় গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তি তাঁহার 'হাসির গান'। সমাজের নানা ব্যক্তি ও নানা অবস্থার অসঙ্গতি উপলক্ষ্য করিয়া রঙ্গব্যঙ্গের উৎসারণ হইয়াছে এই গানগুলিতে। এগুলি অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই হাসির গানগুলি তাঁহাকে স্থায়ী আসন দান করিয়াছে। 'কল্কি-অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি প্রহসন তিনি রচনা করেন। হাসির গানগুলি প্রায়ই এই প্রহসনগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

ঐতিহাসিক নাটকগুলিই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী চাণক্যের কূটনীতি, বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব ও গূঢ় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, রাজপুত বীর প্রতাপসিংহের আমৃত্যু স্বদেশপ্রেম, রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের মহত্ত্ব, মহবৎ খাঁর দৃঢ় কর্তব্যপরায়ণতা, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের কঠোর কঠিন সংকল্প, সম্রাট সাজাহানের দুর্বল পুত্রস্নেহ ও অন্তর্বেদনা, আওরঙজেবের নৃশংসতা ও মুহূর্তের বিবেকদংশন, সম্রাট-দুহিতা জাহানারার বলিষ্ঠ নারীত্ব প্রভৃতি—তাঁহার অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি।

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস ও ছোটগল্প

উপন্যাস সকল দেশের সাহিত্যেই আধুনিক সৃষ্টি। প্রাচীন বিশ্ব-সাহিত্যে আমরা উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাই না। আধুনিক যুগের জটিল আবহাওয়া ও বিচিত্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে উপন্যাস জন্মলাভ করিয়াছে ও বর্ধিত হইয়াছে। আধুনিক যুগের ও সমাজের সঙ্গে ইহার অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আমাদের তীব্র সামাজিক অনুভূতি ও প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিই উপন্যাস-রচনায় সার্থকতা দান করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যেও উপন্যাসের জন্ম ও প্রসার ঘটিয়াছে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে। এদেশে যখন ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে তখন হইতেই বাংলা উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত হয়।

উপন্যাসের কলাকৌশলও মূলত আধুনিক। উপন্যাসে একটি কাহিনীর বর্ণনা, বিস্তার ও পরিণতি থাকে এবং সেই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি হয় বিভিন্ন চরিত্রের। বহির্জগতের ঘটনার আলোড়নে নর-নারীর চরিত্রে উপস্থিত হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারাই ঘটনাগুলি হয় নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার, নানা পরিবেশের পরিচয়, বহু-মানুষের হাসি-কান্না, কোলাহল-কলরব। ইহার পরিসর বিস্তৃত; ব্যক্তির অথবা সমাজ-জীবনের বিস্তৃত পরিচয় দিতে ইহা সক্ষম।

ছোটগল্প উপন্যাসের সমসাময়িক রচনা হইলেও উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের মৌলিক প্রভেদ আছে। উপন্যাসের ক্ষেত্র অনেক বড়, কিন্তু ছোটগল্পের পরিসর ছোট। একটি মানুষের জীবনে কত বিচিত্র

ঘটনা ঘটে, কত নূতন পরিবেশে কত নূতন মানুষ তাহার চারিদিকে ভীড় করে, নানা পরিবেশে নানা অভিজ্ঞতার সে সম্মুখীন হয়। এই সব দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বিস্তৃত পরিচয় দিতে উপন্যাসের দীর্ঘ পরিসর সক্ষম। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষুদ্র অবয়বে এত কাহিনী ও পরিচয়ের স্থানসংকুলান হয় না। তাই ছোটগল্পের কলাকৌশলও একটু স্বতন্ত্র। জীবনের এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ বাছিয়া লওয়া হয় যাহা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ; সেই সমস্ত ঘটনা সংযোজিত করিতে হয় যাহা কাহিনীর পক্ষে অতি আবশ্যক, বিন্দুমাত্র অবান্তর নয়। ছোটগল্পের কাহিনী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে এবং উপসংহার ঘটিবে নাটকীয়ভাবে। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া পরিণতি দর্শানোর সময় ইহার নাই। উপন্যাসে আমরা পাই দীর্ঘ-জীবনের বিস্তৃত প্রকাশ। আর ছোটগল্পে পাই জীবনের ক্ষুদ্র অথচ দীপ্ত অনুভূতিগুলির রূপায়ণ।

গল্প ও উপন্যাসকে একত্রে বলা হয় কথাসাহিত্য। এই আধুনিক কথাসাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নাই। তবে ইহার একটি অমার্জিত ও অপরিণত রূপের সাক্ষাৎ মেলে উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ছোট ছোট গল্প বা আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে'র নীতিমূলক গল্পগুলির অনেকই এইরূপ। পালি-সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাতক'-এর কাহিনীতে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের উপদেশচ্ছলে নানা গল্প বলিয়াছেন। গল্পগুলি সুন্দর, কিন্তু ইহাদের মূললক্ষ্য নীতি-উপদেশ-প্রচার। ইহা ছাড়া দুই-একখানি কাহিনী-বর্ণনামূলক গ্রন্থও দেখা যায়, যেমন সংস্কৃত-গদ্যে লেখা 'দশকুমার-চরিত', 'কাদম্বরী'।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। তাঁহার হাতেই প্রথম বাংলা উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা-সাহিত্যেও দুই-একখানি উপন্যাস রচনার প্রয়াস দেখা যায়।

কিন্তু এইগুলি সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ আধুনিক উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণে সমৃদ্ধ নহে। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক আধুনিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথও তেমনই সার্থক ছোটগল্পের স্রষ্টা। ছোটগল্পের পরিপূর্ণ রূপটি আমরা প্রথম তাঁহার গল্পেই দেখিতে পাইলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাস-বিচারে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণা, একটি কাহিনীর বর্ণনা ও পরিণতি দর্শানো—প্রভৃতি উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি উপন্যাসটিতে ছিল। কিন্তু তবুও আধুনিক উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। ঘটনার আলোড়নে নরনারীর চরিত্রে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা বহির্মুখী ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। অথচ 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে আধুনিক উপন্যাসের এই প্রধান লক্ষণটিই নাই। ঘটনার সংঘাতগুলি অন্তর্জগতের গভীরে পৌঁছায় নাই, বহির্জগতেই সীমাবদ্ধ। তাই উপন্যাসখানি সে-যুগের শিক্ষিত পাঠকের উপন্যাস-পাঠের আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই সাহিত্যের এই শাখাটির অপূর্ণতা গভীরভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। ইংরেজী উপন্যাসের রস তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজের জীবন-ধারা ও রীতিনীতি তাঁহাদের কাছে আবেদনহীন ও কল্পনার সামগ্রী ছিল। খাঁটি বাংলা উপন্যাসের রস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে তীব্র হইয়া উঠে। এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অনন্যসাধারণ সৃজনী-প্রতিভা লইয়া বাংলা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাণ্ডারের সমস্ত সুধা তিনি পান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে ছিল একটি শক্তিশালী সৃষ্টির প্রেরণা। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হাতে বাংলা উপন্যাস যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিল। বঙ্কিম ছিলেন আদর্শবাদী ও স্বদেশপ্রেমিক। গভীর দেশপ্রীতি, জাতীয় আত্মমর্যাদা-বোধ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি, সুদূরপ্রসারিণী কল্পনাশক্তি তাঁহার শিল্পি-মানসে সদাজাগ্রত ছিল। জাতির ভাব-কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্য-রূপ দান করিবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র।

বঙ্কিম যখন উপন্যাস-রচনায় অগ্রসর হইলেন, তখনও বাংলা গদ্য-সাহিত্য সুপরিণত রূপ লাভ করে নাই। একদিকে টেকচাঁদের ভাষা অপরদিকে পণ্ডিতী ভাষা আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য পরস্পর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ। খাঁটি বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপটি তখনও দেখা দেয় নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিম যে বাংলা গদ্যের আশ্রয় লইলেন, তাহা পুরাপুরি আলালী ভাষাও নহে, আবার সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষাও নহে। তিনি আলালী ভাষা ও সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষার মিলন ঘটাইয়া সহজ ও গভীর সকল প্রকার ভাব প্রকাশে সক্ষম, শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল অথচ বেগবান্ বাংলা গদ্যের প্রচলন করিলেন। এই নূতন বাংলা গদ্য-রীতির প্রচলন তাঁহার একটি অনন্যসাধারণ কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম, ঐতিহাসিক উপন্যাস; দ্বিতীয়, সামাজিক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাস। অবশ্য তাঁহার কোন উপন্যাসই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় নাই। তিনি ইতিহাসের ঘটনাগুলির উপর নিজস্ব কল্পনা ও আদর্শ আরোপ করিয়াছেন। ফলে ইতিহাসের অনেকাংশই কল্পনা-রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। বহু নূতন চরিত্রও তিনি কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি

করিয়া লইয়াছেন। জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রবল আশাবাদ ও উচ্ছ্বসিত দেশভক্তির প্রাবল্যে ইতিহাসের উপাদানগুলি ভাসিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাসের সামান্য ইঙ্গিতমাত্র আছে, যথার্থ ইতিহাস নাই। অতএব তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে ধরিয়া লইতে হইবে সেইগুলি যাহাতে ইতিহাসের অল্পবিস্তর স্পর্শ আছে। যেমন—'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'।

দুর্গেশনন্দিনীতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পরিবেশের মধ্যে তিনি উপন্যাসের কাহিনীটি স্থাপন করিয়াছেন। চরিত্রগুলির মধ্যে মানসিংহ, জগৎসিংহ, কতলু খাঁ খাজা ইসা, ওসমান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বাংলা ও উড়িষ্যায় মোগলপাঠানের বিরোধ-কাহিনী ইহার পটভূমিকা। কাহিনীটি এইরূপ: মোগল-পাঠানের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের জন্য বীরেন্দ্রসিংহ নামে এক দুর্গের অধিপতির ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তাঁহার কন্যা কুমারী তিলোত্তমার সঙ্গে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের পরিচয় হয় এক দুর্যোগের রাত্রিতে শৈলেশ্বরের মন্দিরে। তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হয়। এদিকে নানা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া বীর বীরেন্দ্রসিংহ পাঠানদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। যুদ্ধে জগৎসিংহ বন্দী হইলেন এবং তাঁহার বন্দীদশাতেই নবাব-নন্দিনী আয়েষা জগৎসিংহকে ভালবাসিয়া ফেলিল। শেষে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল এবং তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের বিবাহ হইল। আয়েষা হৃদয়ের গভীর দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া ধীর সংযতভাবে তিলোত্তমাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইল।

উপন্যাসখানি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা। সেইজন্য নানা দোষত্রুটি উপন্যাসখানিতে আছে। তবুও দুর্গেশনন্দিনী একটি সুন্দর রচনা। কাহিনী-পরিকল্পনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে, কল্পনা-বিস্তারে তিনি বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীর দ্রুতগতির মধ্যে পাঠক-চিত্তে যে একটি আনন্দ ও উল্লাসের সৃষ্টি হয় তাহা বাঙালী পাঠক এই প্রথম অনুভব করিল। রুদ্ধনিশ্বাসে ক্ষিপ্রগামী একটি কাহিনী অনুসরণ

করিতে গিয়া আমাদের চিত্ত প্রসারিত ও কল্পনা দিগন্ত-বিস্তারী হইল। প্রকৃতপক্ষে এখন হইতে আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব সুত্রপাত হইল।

বঙ্কিম-উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে 'বোমান্স' ও 'বোমান্টিকতা' কথা দুইটীর আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রায়ই রোমান্স-ধর্মী। আমাদের জীবনের পবিচিত অভিজ্ঞতাব বাইরের ঘটনা লইয়া বোমান্স গড়িয়া উঠে। যে সকল ব্যাপার জীবনে সচরাচর ঘটে না কিংবা কদাচিৎ ঘটে, যে কথা শুনিলে আমাদের কল্পনাবৃত্তির স্ফুরণ ঘটে, চিত্তে উল্লাস বা আনন্দের সঞ্চার হয়—তাহাই রোমান্স। এই রোমান্সেব রস আস্বাদনের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ তাহাই রোমান্টিকতা। তাই বোমান্সধর্মী রচনায় থাকে কল্পনার অবাধলীলা, ঘটনার ঘনসমাবেশ এবং প্রেম, বীরত্ব ও শক্তির অসাধারণত্ব।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস মুখ্যত বোমান্সধর্মী। দুর্গেশনন্দিনীও রোমান্টিক উপন্যাস। কল্পনার অবাধ প্রসার, নানা আকস্মিক ঘটনার ঘনঘটা, প্রেম, বীরত্ব সমস্তই উপন্যাসটিতে জমাট বাঁধিয়াছে। বাঙালীর ক্ষুদ্র গৃহজীবনের মধ্যে তিনি সমুদ্রের কল্লোল বহাইয়া দিয়াছেন। বাঙালীর দুহিতার সঙ্গে তিনি সুদূর দিল্লীব রাজসেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথিয়াছেন। শাশ্বত প্রেমের আকর্ষণে গৃহ, সমাজ ও জাতির আবরণ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসখানিতে উৎকর্ষের পরিচয় বিশেষ নাই। তবে স্বদেশপ্রীতির অত্যুজ্জ্বল আদর্শ বঙ্কিম পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চার করিয়াছেন। দেশকে ভালবাসিবার প্রেরণা এই উপন্যাসে আমরা লাভ করি। মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ জয়ের কাহিনী 'মৃণালিনী'তে বর্ণিত হইয়াছে। মগধের এক রাজ্যহারা রাজপুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনী নামে একটি কন্যাকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর গুরুদেব মাধবাচার্যের নির্দেশ ছিল তিনি যেন মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস না করিয়া মৃণালিনীকে গ্রহণ না করেন। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের

মধ্য দিয়া হেমচন্দ্রের দিন অতিবাহিত হয়। অবশেষে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হন এবং মৃণালিনীকে বিবাহ করিয়া সেই নূতন রাজ্যে লইয়া আসেন। অতি-কাব্যধর্মিতায় 'মৃণালিনী' উপন্যাসের সৌন্দর্য হারাইয়াছে। নায়ক হেমচন্দ্রের চরিত্র আরও দৃঢ়তার দাবী রাখে।

চন্দ্রশেখব' বঙ্কিমন্দ্রেব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-সমূহেব অন্যতম। ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনাজালেব সহিত আমাদেব পারিবাবিক জীবনের যোগাযোগ অতি স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছে। বৃহত্তব রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ক্ষুদ্র পাবিবারিক জীবন একই তালে স্পন্দিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন আশু পরিবর্তনমুখী। মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংসোন্মুখ এবং ইংবেজ-রাজত্ব আসন্ন। বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশেম ইংবেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইংরেজ বণিক্‌গণ সাম্রাজ্য স্থাপনের অপেক্ষা অর্থ-উপার্জনের মোহে প্রজা-শোষণে ব্যাপৃত। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা, জাতির জীবনে এক মহাসঙ্কট। এই দুর্যোগের আঘাত লাগে একটি বাঙালী পরিবারে। শাস্ত্রপাঠ ও অধ্যাপনা লইয়া নিভৃতে দিন কাটাইতেন চন্দ্রশেখর। তাঁহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী শৈবলিনী এক উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজ পুরুষের নজরে পড়ে। সে শৈবলিনীকে নবাব-অন্তঃপুরে উপহার দিবার জন্য গোপনে অপহরণ করে। পরিশেষে বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া বীরত্ব ও কৌশলে শৈবলিনীকে উদ্ধার করা হয়। ইহাই উপন্যাসটির কাহিনী।

বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রধানগুণ ইহার কাহিনী। বিচিত্র ঘটনার ঘূর্ণি পাঠককে দ্রুত গতিতে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। চন্দ্রশেখরে বিচিত্র ঘটনার জটিল আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং রোমান্সের উপযুক্ত অতি-নাটকীয় পরিবেশও রচনা করা হইয়াছে।

উপন্যাসটির চরিত্রসৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্র নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শৈবলিনী উপন্যাসের নায়িকা। তাঁহার মত জটিল চরিত্রের নারী

বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নাই। একাধারে বিচিত্র প্রবৃত্তি ও দোষগুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে। বীর, চরিত্রবান্ প্রতাপ এই উপন্যাসের আদর্শ চরিত্র। পতি-ভক্তি ও পতিপ্রেমের আদর্শ দেখাইয়াছেন নবাব-মহিষী দলনী বেগম।

'রাজসিংহ'কেই অনেকাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। রাজসিংহে মধ্যযুগের রাজপুত-ইতিহাস হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার কাহিনী—মোগল সম্রাট আওরঙজেবের সঙ্গে রূপনগরের ক্ষুদ্র হিন্দু রাজার বিরোধ। নায়ক শক্তিমদমত্ত মোগল-সম্রাট আওরঙজেব এবং নায়িকা ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী। রাজপুত জাতির সম্মান রক্ষার জন্য বীর রাজসিংহ রূপনগরের রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু ইহার ফলে তাঁহাকে শক্তিশালী মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। মোগল-সম্রাট আওরঙজেব রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রাজকন্যাকে না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। সামান্য রাজপুতরাজের এত স্পর্ধা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইল। তিনি রাজসিংহের হাতে পরাজিত হইলেন এবং অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

উপন্যাসের আওরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নেসা, উদিপুরী প্রভৃতি চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমের চিরদিনের আদর্শ দেশপ্রেম পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দুগণ যে বাহুবলে দুর্বল ছিল না এই বিষয়টি তিনি রাজসিংহে প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। পরাক্রান্ত মোগলশক্তির পরাজয়ে হিন্দুবীরদের শৌর্য ও বীরত্বের যে পরিচয় আছে, বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয় ভরিয়া সেই উদ্দীপনা ও আবেগ অনুভব করিয়াছেন এবং পাঠক-চিত্তে পরিবেষণ করিয়াছেন।

পরবর্তী উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'

বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষা, অধ্যাত্মবাদ ও লোকধর্ম প্রচার করিয়াছেন। ফলে উপন্যাসগুলি প্রচারধর্মী হইয়াছে এবং উপন্যাসের প্রকৃত রস-পরিবেষণে সক্ষম হয় নাই।

বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনীর পটভূমিকায় আনন্দমঠের কাহিনী পরিকল্পিত। এইসময় সর্বত্র অরাজকতা চলিতেছিল। এই অরাজকতার সুযোগ লইয়া উত্তরবঙ্গে একটি সন্ন্যাসিবিদ্রোহ দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সন্ন্যাসি-বিদ্রোহকে বাঙালীর এক জাতীয়তামূলক আন্দোলন বলিয়া কল্পনা করেন। সন্ন্যাসিগণ প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এই বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছেন—ইহাই উপন্যাসখানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য।

আনন্দমঠ বাঙালীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিল। দেশের উন্নতির কার্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহারা নিজেদের সুখদুঃখের কথা ভুলিবেন এবং গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের অনুসরণ করিবেন—এই আদর্শই আনন্দমঠের মর্মকথা। সত্যানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ এক সর্বত্যাগী সন্তানদল গঠন করেন এবং জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। যাঁহারা এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা সকলেই দেশজননীর সন্তান, মাতৃমুক্তি তাঁহাদের আমৃত্যু পণ। সন্তানগণের দেশভক্তির যে সুকঠিন আদর্শ পালনের নিদর্শন আনন্দমঠে আছে, তাহাই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালীকে আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। উপন্যাসখানি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ প্রচারের বাহন বলিয়া মনে করা চলিতে পারে। বাঙালীর দেশাত্মবোধের আদিমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' ইহাতেই উচ্চারিত হইয়াছে। তবুও আনন্দমঠের কাহিনীর অন্তরালে প্রেম, স্নেহ, কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মানবিক অনুভূতিগুলির পরিচয় আছে।

'দেবীচৌধুরাণী'তে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ও আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাসটি ধর্মব্যাখ্যানমূলক এবং ইহার

প্রতিপাদ্য বিষয় নিষ্কাম-ধর্ম ও দেশপ্রীতি। কাহিনী-পরিকল্পনায় ঐতিহাসিক সত্যের একটু ছায়া পাওয়া যায়।

মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ-শাসন তখনও দৃঢ় হয় নাই। চারিদিকে ঘোর অরাজকতা। এমনি সময় ত্যাগ-ধর্মে দীক্ষিত ভবানী পাঠক নামে এক ব্যক্তি এক শক্তিশালী দল গঠন করিয়া অরাজকতা রোধ করিয়া শাসন-ক্ষমতা দখল করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার মূল লক্ষ্য দেশের পরাধীনতা ও অরাজকতা দূর করা। তিনি প্রফুল্ল নামে এক গৃহস্থবধূকে তাঁহার দস্যুদলের নায়িকা করিলেন। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে এই গুরুব্রতের উদ্দেশ্যে দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাকে দলের দেবী বা জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। কুলবধূ প্রফুল্লের 'দেবী চৌধুরাণী' নামকরণ হইল। কিন্তু পরিশেষে ভবানী পাঠকের সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই শক্তিময়ী নারীকে পুনরায় গৃহমধুর মর্যাদা দিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। দস্যু-নায়িকা প্রফুল্ল পুনরায় গৃহবধূ প্রফুল্লে রূপান্তরিত হইল।

উপন্যাসটিতে বঙ্কিম এই আদর্শই প্রচার করিলেন যে, মানুষ কখনও দেবতা হইতে পারে না। সে যত বড় উন্নতই হউক, আর যত উচ্চ আদর্শই পালন করুক, তাহার অন্তরের শাশ্বত মানবিক বৃত্তি তাহাকে চিরদিনই মাটির দিকে টানিতেছে। তাই দেবী চৌধুরাণী হইয়াও প্রফুল্ল মানবীত্ব ও নারীত্ব ত্যাগ করিতে পারিল না।

'সীতারাম' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনে রচিত। মধ্যযুগের একটি ক্ষুদ্র হিন্দু-রাজার কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। রাজার নাম সীতারাম, তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা ও রমা। প্রথমা স্ত্রী শ্রীর সঙ্গে বিবাহের পরেই তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই স্ত্রীই তাঁহার জীবনে এক বিপর্যয় আনিল। সীতারাম কর্মী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মনে শিবাজীর মত এক বিশাল হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সদাজাগ্রত ছিল। দৈবের কারণে তিনি আপন প্রথমা

স্ত্রী শ্রীকে গ্রহণ করেন নাই ; অবশেষে সেই স্ত্রী তাঁহার পতনের কারণ হইল। তাঁহার সকল স্বপ্ন ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

সীতারামের পতনের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের চিরন্তন দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। স্নেহ, প্রেম, কামনা-বাসনা প্রভৃতি মানবিক হৃদয়বৃত্তিগুলি সময় সময় যে কি দুর্জয় শক্তি ধারণ করিয়া আমাদের জীবনে সর্বনাশ আনে, তাহার চিত্র তিনি দেখাইয়াছেন।

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির আলোচনা করিব। 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁহার পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘ সামাজিক উপন্যাস। 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'রজনী' উপন্যাসধর্মী বড় গল্প। আমাদের সমাজের ও পরিবারের নানা চিত্র এই উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখিতে পাই। সামাজিক সমস্যা বলিতে অবশ্য সে-যুগের দুইটি সমস্যাই প্রধান ছিল—বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে প্রধানত এই দুইটি সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে একটি অভিনব রস-বস্তু তিনি উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহার কাহিনী একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যদি কোন নারী শিশুকাল হইতে যৌবন পর্যন্ত কোন নির্জন দ্বীপে একটি সমাজবন্ধনের বাহিরে লালিত-পালিত হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ হইবে ? কোন ব্যক্তি যদি তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী করে, তবে সে কি সংসার অথবা সমাজের বন্ধন স্বীকার করিবে? এইরূপ একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা এই উপন্যাসের নায়িকা। শৈশব হইতে সে সমুদ্র-তীরের অরণ্যে এক নির্জন দ্বীপে লালিত-পালিত হয়। ঘটনাচক্রে এক সংসারী যুবক নবকুমার তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া আসে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা সমাজে আসিয়াও সংসারী ও গৃহিণী হইতে পারিল না। নির্জন সমুদ্রতীরের মুক্ত জীবনের আকর্ষণ সে ভুলিতে পারিল না। তাহার আচরণে সামাজিক নারীর স্বাভাবিকতা দেখা গেল না।

কপালকুণ্ডলার কাহিনীর পরিকল্পনায় বঙ্কিম সুদূরপ্রসারিণী কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সমুদ্রতীরের উদার প্রকৃতির মধ্যে তিনি এই সংসার-অনভিজ্ঞ সরল বালিকাকে বর্ধিত করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা যেন প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। আবার কপালকুণ্ডলার ভাগ্যের সহিত সুদূর আগ্রার প্রাসাদের এক বিলাসিনী নারী পদ্মাবতীর ভাগ্য একই সূত্রে জড়াইয়া দিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনন্যসাধারণ সাহিত্য-কীর্তি। ইহাই তাঁহার পুরোপুরি সামাজিক উপন্যাস। বাঙালীর ঘরের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না লইয়া যে উপন্যাস রচিত হইতে পারে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হইবার আগে কেহই যেন ভাবিতে পারে নাই।

নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার প্রথমা পত্নী সূর্যমুখী ও দ্বিতীয়া পত্নী কুন্দনন্দিনীর পারিবারিক কাহিনীই উপন্যাসটির বিষয়-বস্তু। নগেন্দ্রনাথ স্ত্রী সূর্যমুখী বর্তমান থাকিতেও বিধবা কুন্দনন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হইলেন। অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিলেন। তখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। কিন্তু ইহার ফল শুভ হইল না। সূর্যমুখী এই বিবাহের জন্য স্বামীর প্রতি অভিমান করিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নগেন্দ্রের পারিবারিক জীবনে দুর্যোগ দেখা দিল। নগেন্দ্র তখন কুন্দের প্রতি বিরক্ত হইলেন। তাহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সূর্যমুখী আবার গৃহে ফিরিলেন। কুন্দ স্বামীর উপেক্ষা ও অপমান সহ্য করিতে পারিল না, বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিল। পুনরায় নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলন ঘটিল।

উপন্যাসটির চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের রূপজ আকর্ষণ অতি কৌশলের সঙ্গে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; কুন্দের চরিত্ররূপায়ণেও তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। কুন্দ বিধবা, নগেন্দ্রের প্রতি তাহার আকর্ষণ অবৈধ, তবুও নগেন্দ্রের প্রতি তাহার ভালবাসা তিনি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। বাঁধাধরা নৈতিক আদর্শের

কাছে তাঁহার শিল্পিমনকে সঁপিয়া দেন নাই। নগেন্দ্রের ভগিনী কমল আর একটি সার্থক চরিত্র। বাঙালী নারীচরিত্রের যে স্নিগ্ধ মাধুর্য আছে, তাহার যে কল্যাণী মূর্তি আছে, তাহার নিদর্শন মেলে কমলের মধ্যে। সে স্বামি-সৌভাগ্যবতী ও জননী। বঙ্কিমচন্দ্র কমলকে বলিয়াছেন 'সোনার কমল'।

বিষবৃক্ষের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একখানি সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস। জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল তাহার বিবাহিত স্ত্রী ভ্রমর থাকিতেও এক বিধবা নারীর রূপে আকৃষ্ট হইল। তাহার পদস্খলন ঘটিল এবং তাহারই পরিণামে তাহার জীবন হইল বিষময়। কৃষ্ণকান্ত বিরাটব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, দৃঢ়চেতা জমিদার ছিলেন। তাঁহার নিজ পুত্র হরলাল উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বহীন হওয়ায়, তাহাকে তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং গোবিন্দলালকে নিজপুত্রের মত মানুষ করিয়া তাহাকে বিষয়ের অধিকারী করিলেন। গোবিন্দলাল সৎ, মহৎ ও সুপুরুষ ছিল। কিন্তু বালবিধবা সুন্দরী রোহিণী তাহার জীবনে ঘটাইল দারুণ বিপর্যয়। তখন বিধবা-বিবাহ সমাজে চালু হইয়াছে। রোহিণীও বিবাহের স্বপ্ন দেখিত। সে হরলালকে ভালবাসিত। কিন্তু হরলাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। তখন রোহিণী জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে চাহিল। গোবিন্দলাল তাহাকে জল হইতে তুলিয়া বাঁচাইল, কিন্তু তাহার রূপে গোবিন্দলাল আকৃষ্ট হইল। রোহিণীকে লইয়া সে সব-কিছু ভুলিয়া রহিল। স্বামীর এই সমস্ত কাহিনী ভ্রমরের কানে পৌঁছিল। সে অভিমান করিয়া স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু রোহিণীর প্রেমে গোবিন্দলাল আস্থা হারাইল। রোহিণী গোবিন্দলালের বিশ্বাসভঙ্গ করিল। পরিশেষে গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে হত্যা করিল। ভ্রমর স্বামি-চিন্তায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মৃত্যু-শয্যা গ্রহণ করিল। মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর সঙ্গে তাহার শেষ সাক্ষাৎ ঘটিল। ভ্রমরের মৃত্যুর

পর গোবিন্দলাল সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিতে লাগিল।

উপন্যাসটির পরিণতি বিষাদজনক। চরিত্রগুলির মধ্যে ভ্রমরচরিত্র উল্লেখযোগ্য। আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র যেন ভ্রমরের মাধ্যমে পাতিব্রত্যের আদর্শ বঙ্গনারীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রোহিণীকে তিনি ঘৃণা করেন নাই। তাহার দুঃখ-বেদনা গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন। চরিত্রগুলি বাস্তব ও জীবন্ত।

বড় গল্পের মধ্যে 'ইন্দিরা' ঘটনাধর্মী। ইহাতে চরিত্র-বিশ্লেষণের বিশেষ স্থান নাই। পতিগৃহে যাইবার পরে ইন্দিরা কালাদীঘিতে ডাকাতের হাতে পড়ে। পরে অন্যের গৃহে থাকিয়া নানা কৌশলে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। কাহিনীটির বর্ণনায় বঙ্কিম নূতন প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দিরা নিজেই এখানে বক্তা। নিজের কাহিনী সে নিজেই বলিয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী কাহিনী 'রজনী'তেও বঙ্কিম এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। তবে রজনীতে প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ কাহিনী বলিয়া গিয়াছে। অন্ধ বালিকার অনুরাগ-স্ফুরণের চিত্রাঙ্কনে তিনি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। লর্ড লীটনের 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' উপন্যাসটির প্রভাব ইহার উপর আছে। 'রাধারানী'র কাহিনী অতি ক্ষুদ্র। 'যুগলাঙ্গুরীয়' একটি প্রণয়কাহিনী। কাহিনী দুইটিই মিলনান্তক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষার নিদর্শন এইরূপ,—

> যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতাসকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্র মধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বাংলা উপন্যাসের প্রারম্ভিক পর্বে রমেশচন্দ্র দত্তের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি উপন্যাসের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর প্রভাব দেখা যায়। তবে ইতিহাসের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ রমেশচন্দ্র একজন ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস-বোধ ছিল তীক্ষ্ণ। কোন নীতি প্রচার বা আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিতে স্বীকৃত হন নাই।

রমেশচন্দ্র চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও দুইখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নাম—'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা'। সামাজিক উপন্যাস দুইখানির নাম—'সংসার' ও 'সমাজ'।

'বঙ্গ-বিজেতা' রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। ঘটনাটি মোগল সম্রাট আকবরের সময়কার। রাজা টোডরমল্ল যখন বাংলার শাসন-কর্তা ছিলেন, তখন বাংলায় এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালী যুবক রাজপক্ষ লইয়া অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দেয়। এই বিদ্রোহ অল্প সময়ের মধ্যেই থামিয়া যায়। বাঙালী যুবক ইন্দ্রনাথই বঙ্গবিজেতার নায়ক। ইন্দ্রনাথের বীরত্ব ও উন্নত চরিত্র দেখিয়া রাজা টোডরমল্ল প্রীত ও মুগ্ধ হন। টোডরমল্লের একান্ত বিশ্বাসভাজন এক জমিদার ছিলেন। তাঁহার নাম সমরসিংহ। শকুনি নামে এক খল ও পাষণ্ডের প্ররোচনায় সতীশচন্দ্র সমরসিংহকে কুট কৌশলে হত্যা করে এবং সমরসিংহের বিস্তীর্ণ জমিদারির মালিক হয়। সমরসিংহের বিধবা রাণী মহাশ্বেতা ও কন্যা সরলা অতি দুঃখে দিন কাটাইতে থাকে। স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মহাশ্বেতার

মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠে। বীর ইন্দ্রনাথ ছিল সমর-সিংহের বন্ধুপুত্র। ইন্দ্রনাথ সরলাকে ভালবাসিত। সতীশচন্দ্রকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ইন্দ্রনাথ আগাইয়া আসিল। সতীশচন্দ্র তাহার আশ্রিত ও পরামর্শদাতা শকুনির চরের বিষাক্ত ছুরির আঘাতে প্রাণ হারাইল। শকুনিও ধৃত হইয়া বিচারক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিল। সরলার সঙ্গে বীর ইন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হইল।

উপন্যাসটির রচনায় রমেশচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকে তিনি কাহিনীর আকারে একত্র করিয়া উপন্যাসে পরিবেশন করিয়াছেন। চরিত্রগুলি সজীব হয় নাই। ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের শক্তি তাঁহার ছিল না। এ শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল অসাধারণ। উপন্যাস-রচনায় কল্পনার অবাধ প্রসারণের প্রয়োজন। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলির মাঝে অনেক পরিসর থাকে, কল্পনার সাহায্যে তাহা পূরণ না করিলে কাহিনী সুন্দর হইয়া উঠে না। কিন্তু রমেশচন্দ্রের কল্পনাশক্তির অভাব ছিল। বঙ্কিমের সুদূর-প্রসারিণী কল্পনা তাঁহার থাকিলে তিনি আদর্শ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হইতে পারিতেন।

পরবর্তী উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ' অনেক দোষত্রুটি-মুক্ত ও উন্নত রচনা। মাধবীকঙ্কণের কাহিনী সম্রাট শাজাহানের সময়কার। শাজাহানের পুত্রগণের কলহ ও দ্বন্দ্বের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। মাধবীকঙ্কণের কাহিনী এইরূপ : বীরনগরের জমিদার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুর সময় তাঁহার জমিদারি ও শিশুপুত্র নরেন্দ্রের ভার দেওয়ান নবকুমারের হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। কিন্তু নবকুমার বীরেন্দ্রনাথের সমস্ত জমিদারি গ্রাস করিল, নরেন্দ্রনাথের প্রতিও তাহার কর্তব্য পালন করিল না। নবকুমারের কন্যা হেমলতাকে নরেন্দ্রনাথ ভালবাসিত। একদিন হেমলতার হাতে প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ নরেন্দ্র মাধবীলতার একটি কঙ্কণ পরাইয়া দিল। কিন্তু নবকুমার তাহাদের প্রণয়ে বাধা দিল। নরেন্দ্র অভিমানে গ্রাম ত্যাগ করিল।

সুদূর রাজমহলে গিয়া মোগলদের ঐতিহাসিক ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে জড়াইয়া পড়িল এবং সুজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল। এদিকে নবকুমার শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ দিলেন এবং শ্রীশচন্দ্রকে সমস্ত জমিদারি দান করিলেন। বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন ঘটনাচক্রে মথুরায় গোলোকনাথের মন্দিরে নরেন্দ্রের সঙ্গে হেমলতার সাক্ষাৎ ঘটিল। হেমলতা তখন বিবাহিতা ও পরস্ত্রী। হেমলতা নরেন্দ্রনাথের হাতে তাহার পূর্ব প্রণয়চিহ্ন মাধবীকঙ্কণটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল,—'আজ হইতে তুমি আমার ভ্রাতা।' নরেন্দ্র মাধবীকঙ্কণটি যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিল।

উপন্যাসটিতে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটা। কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে নরেন্দ্র-হেমলতার প্রণয়কাহিনীটুকু সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসেব সার্থকতা দান করিয়াছে। নরেন্দ্র ও হেমলতার প্রণয় বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রেব চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়-কাহিনীর প্রভাব আছে।

'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' মোগলসম্রাট আওরঙজেবের সঙ্গে মারাঠা বীরদের সংঘর্ষ অবলম্বনে লিখিত। ইহা মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর অভ্যুত্থানের ইতিহাস। শিবাজীর ভারতব্যাপী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্প, তাঁহার সুচতুর রণকৌশল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যশোবন্ত সিংহকে স্বদলে আনিবার জন্য বাগ্মিতার জালবিস্তাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চিত্রগুলি সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছে। চরিত্রগুলি প্রায় সবই সুচিত্রিত ও স্বাভাবিক। শিবাজীর চরিত্রে মানবিকতার দিকটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে রমেশচন্দ্রের স্বদেশভক্তি অনাবিলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

পরবর্তী উপন্যাস 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' রাজপুত জাতির পতনের ইতিহাস। মোগলসম্রাট আকবরের সহিত রাজপুত বীর রাণাপ্রতাপের নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামের কাহনী ইহার বিষয়বস্তু। এখানেও

রমেশচন্দ্রের গভীর স্বদেশপ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতদের বীরত্বের উপর তাঁহার ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু এই শেষোক্ত উপন্যাস দুইটিতে ইতিহাস-কাহিনী অধিক স্থান লাভ করায় উপন্যাসের রসহানি ঘটিয়াছে। মানবিক অনুভূতিগুলি যথাযোগ্য রূপ পায় নাই।

রমেশচন্দ্র উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী। তাঁহার কবিত্বশক্তির বর্ণনাভঙ্গী, ভাব, ভাষা, এমনকি চরিত্রসৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব গভীর। তবুও কয়েকটি রচনায় তাঁহার স্বকীয়তার স্বাক্ষর মেলে। ভাষার দিক হইতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা সহজ ও সবল হইয়াছেন। দীর্ঘ ও জটিল বাক্য অপেক্ষা হ্রস্ব ও সরল বাক্যেই তিনি ভাবপ্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতি-বর্ণনায় ও আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশে তিনি কবিত্বশক্তির পরিচয়ও দিয়াছেন।

'সংসার' ও 'সমাজ' দুইখানি সামাজিক উপন্যাসে তিনি উপন্যাস রচনার কৃতিত্বের সমধিক পরিচয় দিয়াছেন। অল্প কয়েকটি চরিত্র লইয়া পল্লীর শান্ত সহজ সরল সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্র সুন্দরভাবে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমের মত জমিদার বা উচ্চ-মধ্যবিত্তের জীবনকাহিনী লেখেন নাই। তাঁহার অবলম্বন ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন। ইহাদের আলোচ্য সমস্যা—বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষার একটু নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল,—

> সেই তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁটাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেই ছায়া শীতল এবং তাহার নিকটে ৫,৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর-বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটি মাচানের উপর লাউগাছে লাউ হইয়াছে, অপরদিকে কাঁটাল গাছ ও জঙ্গল।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের অতি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। স্নিগ্ধ সরস হাস্যরস ও অনাবিল কৌতুকের মধ্য দিয়া তিনি বাঙালীকে তাহার ঘরের ও সমাজের চিত্র উপহার দিয়াছেন। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা তাঁহার ছোটগল্পই উৎকৃষ্টতর। ছোটগল্প-রচনায় তিনি যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রভাতকুমার জীবনের অথবা সমাজের গভীর অথবা সমস্যাসঙ্কুল দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। জীবনের সহজ, সরল ও লঘু দিক লইয়াই ছিল তাঁহার কারবার। মানবমনের গহন অন্ধকারে ডুব দিয়া সেখানকার জোয়ার-ভাঁটার খবর লওয়া, সমাজের কঠিন এবং কণ্টকাকীর্ণ সমস্যাগুলির সমাধান করা, নূতন জীবনদর্শনের প্রচার প্রভৃতি—প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের প্রচেষ্টা তাঁহার ছিল না। জীবনের উপরিভাগে লঘুভাবে দাঁড়াইয়া নিত্যকার জীবনের যে সামান্য হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতি, তাহাই তিনি উপভোগ করিয়াছেন এবং অনাবিল হাসি ও কৌতুকের সঙ্গে পরিবেশন কবিয়াছেন। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের বৈচিত্র্যহীন জীবনে তিনি রোমান্সের খোঁজ পাইয়াছেন। জীবনের শুষ্কতার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন কৌতুকরস। তাঁহার উপন্যাসের পাত্রপাত্রী অসাধারণ কেহ নাই। সকলেই অতি সাধারণ ও সহজ। বিচিত্র ভাবের উন্মাদনা সৃষ্টি, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের আলোড়ন, মনের উত্থান-পতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুকৌশল রূপায়ণ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নাই। কাহিনীগুলি সবই সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'সিন্দূরকৌটা' উল্লেখযোগ্য।

'রমাসুন্দরী'ই প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস। ইহা পারিবারিক

চিত্র। 'সিন্দূরকৌটা' একটি প্রণয়কাহিনী। উপন্যাস দুইখানিতেই কাহিনীর বর্ণনা অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। 'রত্নদীপ' একটি দীর্ঘায়তন উপন্যাস। বহু বিচিত্র ঘটনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঘটনার আবর্তে সৃষ্ট চরিত্রগুলিও সুন্দর রূপলাভ করিয়াছে। পাঠকের মনকে আকর্ষণ করিবার শক্তি উপন্যাসটির গভীর।

প্রভাতকুমারের গল্পের বইয়ের সংখ্যা অনেক। তিনি অজস্র গল্প রচনা করিয়াছেন। প্রতিটী গল্পই সুখপাঠ্য ও সুন্দর। 'নবকথা' 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি', 'পত্রপুষ্প' 'গহনার বাক্স', 'জামাতা বাবাজী' গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। মূক পশুর সঙ্গে মানবমনের সম্বন্ধ লইয়া তিনি দুইটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন। গল্প দুইটির নাম 'আদরিণী' ও 'কুকুরছানা'। 'আদরিণী'তে একটি হাতির সঙ্গে এক বৃদ্ধ মোক্তারের স্নেহের সম্পর্কটি তিনি অতি দক্ষতার সহিত ফুটাইয়াছেন।

সাময়িক নানা লঘু সমস্যা ও বিষয় লইয়াও প্রভাতকুমার গল্প রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক বিষয় লইয়া এই সমস্ত গল্প রচিত হইলেও ইহাতে সাময়িক উত্তেজনা প্রকাশ পায় নাই। কৌতুকরসে গল্পগুলি অভিষিক্ত।

প্রভাতকুমার ছিলেন মুখ্যত হাস্যরসিক, ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় 'হিউমারিস্ট'। তাঁহার হাস্যরসে কোন জ্বালা বা বিদ্রূপ নাই। তিনি স্নিগ্ধ ও মধুর হাস্যরসের পরিবেশক। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর হাস্য-রসিক বিরল। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁহার তুলনা চলে। কিন্তু দীনবন্ধু অপেক্ষা তিনি অধিক রুচিশীল।

সব চাইতে চমৎকার প্রভাতকুমারের গল্প বলিবার ভঙ্গীটি। অতি সহজেই তিনি পাঠকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভূমিকার আয়োজন নাই, কাহিনীর ঘনঘটা নাই, জম-জমাট আসরে বসিয়া তিনি যেন দক্ষ কথকের মত সরস ভাষায় দ্রুত বলিয়া গিয়াছেন। ছোটগল্পে এই শিল্পরীতির যথেষ্ট নিদর্শন দেওয়া যায়,—

অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থ মূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকলেবর ভাওলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি, লাঠিখানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া দাঁড়ি-মাঝির খোরাকীর জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—'কর্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভরবে ?'

'সে কি রে, চার আনা কি কম হল ?'

'হুজুর, চার সের চাল কিনতেই ত' চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, নুন তেল আছে—'

'নে, নে—আর দু'গণ্ডা পয়সা নে।' বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গণিয়া, আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন।'

(কুড়ানো মেয়ে)

লণ্ডন নগরেব স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে, মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিযা প্রবেশ করিলাম। (ফুলের মূল্য)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আগমন যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারাটি বাঙালী পাঠক অনুধাবন করিতে পারে নাই। তিনি পরিণত শিল্প-প্রতিভার পরিচয় লইয়া আবির্ভূত হইয়া মুহূর্তমধ্যে বাঙ্গালীর হৃদয়মন হরণ করিলেন। কোন লেখকই জীবিতকালে এত খ্যাতি ও প্রীতি লাভে সমর্থ হন নাই।

শরৎচন্দ্রের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ, তাঁহার রচনায় বাঙালী তাহার ঘরোয়া জীবনের একেবারে অন্তরঙ্গ ছবিটি দেখিতেপাইয়াছে। তিনি আমাদের নিত্যকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানকার হাসিকান্না, সুখদুঃখ, প্রেম-অনুরাগ ঈর্ষা-কলহ, ঘোঁট-দলাদলির খবর জানিয়াছেন ; তার পর গভীর সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে তাহা পরিবেশন করিয়াছেন। রাজা-বাদশা অথবা বড় ঘরের মানুষদেব কথা তিনি শুনাইতে চাহেন নাই। পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত ও সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ছিল তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। তারপর শরৎচন্দ্র বাঙালী-হৃদয়ের গোপন খবরটি জানিতে পারিয়াছিলেন। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের মনটি পলিমাটিতে তৈরী। স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতায় বাঙালীর মনোভূমি সর্বদাই সিক্ত। করুণ-রসের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বেশি। শরৎচন্দ্র এই মায়া-মমতার মধু তাঁহার রচনার মধ্যে সিঞ্চন করিয়াছেন। চোখের জলের ছোঁয়াচ সব রচনাতেই লাগিয়াছে। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ তাঁহার মধুর ভাষা। সহজ, সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষা ব্যবহারে তিনি দক্ষ ছিলেন। এত সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় পূর্বে কেহ লেখেন নাই।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও কথাসাহিত্যের প্রভাব ছিল তাঁহার উপর অপরিসীম। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতার মূলে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ', 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি উপন্যাস ও ছোটগল্প—শরৎচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে একথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রায় সমস্তই সামাজিক। কেবল একখানি উপন্যাসে তিনি রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের পারিবারিক জীবনকে ভিত্তি করিয়া যে সকল উপন্যাস তিনি রচনা করিয়াছেন, সেইগুলি প্রথম

পর্যায়ে পড়ে। যেমন, 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', পরিণীতা', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ-বৌ', 'স্বামী', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা' প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলিতে আমাদের বর্তমান পারিবারিক অবস্থা যেরূপ আছে, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলি—যেমন 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি—একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এইখানে শরৎচন্দ্র পূর্বপথ হইতে অনেকটা সরিয়া আসিয়াছেন এবং নূতন পথের সন্ধান দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উপন্যাসগুলিতে প্রেম ও তাহার পরিণতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রেম আমাদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনসম্মত নহে। তিনি যেন প্রচলিত সমাজবিরোধী কতকগুলি ভাব লইয়া দুঃসাহসিক পরীক্ষা করিয়াছেন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উন্মেষের চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিবার-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে আমাদের-জীবনের নানা সমস্যা আনন্দ-বেদনা ও প্রেম-প্রীতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কত সামান্য কারণে আমাদের যৌথ পারিবারিক জীবনে ঝড় উঠিতেছে, ঈর্ষা ও আক্রোশের সঞ্চার হইতেছে, আবার প্রেম, প্রীতি ও বাৎসল্যে শান্ত মধুর হইতেছে—এই সমস্তই শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নরনারীর হৃদয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, মিলন-বিচ্ছেদের ছবি তিনি নিপুণভাবে আঁকিয়াছেন। প্রায় গল্পেই প্রেম তাঁহার উপজীব্য। কোথাও কোথাও প্রীতি-বাৎসল্যই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসগুলির প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব। কতকগুলি উপন্যাস ও গল্পে তিনি তৎকালীন সমাজের অবিচার ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'অরক্ষণীয়া' ও 'বামুনের মেয়ে'তে সমাজের কুপ্রথা ও অবিচারকে তিনি নীরবে তিরস্কার করিয়াছেন। নারীচরিত্রকেই তিনি উপন্যাসে প্রধান আসন দিয়াছেন। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য ও মাতৃত্বে তাঁহার নারীচরিত্রগুলি অনুপম। এমন এক শ্রেণীর কাহিনী তাঁহার আছে. যেখানে নারীহৃদয়ের সন্তান-স্নেহই মুখ্য উপজীব্য—.

যেমন, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি'। বিন্দু, নারায়ণী, মেজদিদি—স্নেহ-মমতায় বাঙালী-জননীর যোগ্য প্রতিনিধি।

আমাদের অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষগুলির প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল অসীম। আপাতদৃষ্টিতে যাহারা পতিত, ঘৃণিত ও অবজ্ঞার পাত্র তিনি তাহাদের মধ্যেও মহত্বের সন্ধান দিয়াছেন। পতিতের প্রতি তাঁহার ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। অকৃত্রিম মানব-প্রেমই তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনের সার্থকতা দান করিয়াছে। জন-দরদী বলিয়া তিনি জনপ্রীতি লাভ করিয়াছেন। মানুষ যেখানে তাহার যোগ্য সম্মান ও স্থান পায় নাই, সেইখানেই মানব-দরদী শরৎচন্দ্র বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহার লেখনী হইয়াছে ক্ষুরধার।

শরৎচন্দ্র কয়েকটি সার্থক ছোটগল্পও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে 'মহেশ' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পের নায়ক মহেশ এক দরিদ্র মুসলমান কৃষকের একটি মূক গরু। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গল্পটি রচিত। গল্পটিতে বাংলার পল্লীসমাজের অবিচার ও অন্যায়ের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। গফুর দীন-দরিদ্র কৃষক। সে-ই মহেশের রক্ষক। দারিদ্র্যের কষাঘাতে সে জর্জরিত। নিজে সে দুবেলা খাইতে পায় না, তাই গরুটিকেও খাইতে দিতে পারে না। কিন্তু হৃদয়হীন সমাজ তাহার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জলের ব্যবস্থা না করিলেও শাস্তি ও নির্যাতনের দিকে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ক্ষুধার্ত মহেশ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পরের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট করে। ইহার ফলে গফুরকে নির্মম শাস্তি ও অপমান সহ্য করিতে হয়। এই নির্যাতনে দিশেহারা হইয়া গফুর তাহার এতদিনের সঙ্গী, উপকারী বন্ধু মহেশকে তীব্র আঘাত হানিয়া হত্যা করে। পরক্ষণেই অনুশোচনায়, দুঃখে, বেদনায় গফুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সমাজই গফুর ও মহেশের এই নির্মম শাস্তির বিধান করিল। এই পশুহত্যার প্ররোচনা জোগাইয়াছে সমাজের নির্যাতন, গফুর নিমিত্তমাত্র। নিষ্ঠুর সমাজের এই নগ্ন ছবি শরৎচন্দ্র নির্মমভাবে

চিত্রিত করিয়াছেন। বিষয়-বস্তুর আবেদনে 'মহেশ' বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির আসনে স্থান পাইবার দাবী রাখে।

'পথের দাবী' উপন্যাসটি নানা সমস্যা ও মতবাদে কণ্টকাকীর্ণ। ইহাতে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা ও তাহার সমাধানের আলোচনা আছে। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় ইংরেজসরকার এই বইটি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। ইহার নায়ক সব্যসাচী বিপ্লবী, সে দেশোদ্ধার কার্যে নিয়োজিত। তাহার চরিত্রে আমরা সেদিনকার বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি ও রাজনীতির পরিচয় পাই।

পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের আদর্শ পুরুষচরিত্রগুলি সবই উদাসীন ও আত্মভোলা প্রকৃতির, যেমন—নরেন, শ্রীকান্ত প্রভৃতি। এইসব চরিত্র আলোচনায় তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কথা মনে পড়ে। তিনি কর্মব্যপদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। একটা ভ্রাম্যমাণ গৃহবিরাগী মন তাঁহার ছিল। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিও ছন্নছাড়া ও আত্মভোলা প্রকৃতির। শ্রীকান্তের গফুর, বজ্রানন্দ, উদাসীনতার উজ্জ্বল নিদর্শন। সংসারের লাভ-ক্ষতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এমন কতকগুলি প্রধান চরিত্রও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—নিষ্কৃতির গিরিশ, চন্দ্রনাথের কৈলাস খুড়ো প্রভৃতি। সমাজকর্মি-রূপে আমরা পাই সব্যসাচীকে, রমেশকে।

কয়েকটি আত্মভোলা কিশোরচরিত্রও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন —'রামের সুমতি'র রামলাল, 'বিন্দুর ছেলে'র অমূল্য, 'মেজদিদি'র কেষ্টধন, 'দত্তা'র পরেশ। এই পর্যায়ে 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথ তাঁহার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সৃষ্টি। এমন নির্ভীক, উদাসীন চরিত্রের কিশোর বিরল-দৃষ্ট।

শরৎচন্দ্রের রচনার একটু নমুনা দেওয়া যাইতেছে,—

> খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই

প্রায় ত্রিশহাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধারতলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

[শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব)

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্য ও কবিতা

প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা কাব্যের গতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায় নাই। প্রথমে ধর্মবিষয়ক গান, পরে রাধাকৃষ্ণ লীলার নাট্যগীতি, তারপর মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে আখ্যায়িকা অবলম্বনে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে রচিত দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথা, একই পদ্ধতিতে বহু কবির রচিত বৈষ্ণবপদাবলী—এই সমস্ত রচনার রূপ পৃথক হইলেও ইহাদের অন্তর্নিহিত একটা সাদৃশ্য ও স্বধর্ম লক্ষ্য করা যায়। এইগুলি একই গতানুগতিক রীতিতে রচিত ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য। ইহাদের ভাব ও ভাষার যে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়, তাহা যুগের পরিবর্তনে বাহিরের পরিবর্তন মাত্র। ইহা তাহাদের মূল স্বভাবের পরিবর্তন নয়।

বাংলা কাব্যে একটা আমূল পরিবর্তন সূচিত হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙালীর ভাব ও চিন্তার এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিল। সাহিত্য-রচনায় আসিল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—এক নূতন আদর্শ। এই অভিনব প্রেরণা ও প্রাণশক্তি বাংলা-কাব্যের এতদিনের ধারাকে এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিল। বাংলা কাব্যের

একমুখীধারা সাগর-সঙ্গমের বিশাল পরিধি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল।

বাংলার নিজস্ব কাব্যধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে বাংলা কাব্যের নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। তাঁহাকে বিদেশী চিন্তাধারা ও সাহিত্যাদর্শের অগ্রদূত বলা যায়। যদিও তিনি পূর্বেকার রচনাভঙ্গী ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবুও তাঁহার বিষয়নির্বাচন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সমাজ-চেতনা, দেশপ্রেম, প্রকৃতি-বর্ণনা প্রভৃতিতে আধুনিক যুগের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যায়।

এই নূতন আদর্শ ও রুচির প্রথম বাঙালী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। রাজপুত জাতির ইতিহাস অবলম্বনে রঙ্গলাল ভারতের অতীত বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও নারীর ত্যাগ ও সতীত্বের কাহিনী-সমন্বিত কয়েকখানি আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন। তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। ইহাই আধুনিক যুগের প্রথম বাংলা কাব্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আধুনিক বাংলা কাব্য যাঁহার হাতে প্রথম নবমূর্তি ধারণ করে, সেই যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি সেই সময়কার হিন্দু কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য তিনি অসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর গভীর অনুরাগের ফলেই তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল ইংরেজী সাহিত্যের কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করিবেন। ধর্মান্তর গ্রহণের পর তিনি হিন্দু কলেজ ছাড়িয়া খ্রীষ্টানদের কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সেখানে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, হীব্রু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর মাদ্রাজে গিয়া তিনি শিক্ষকতা করেন।

সেখানে তাঁহার এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজী কাব্য-রচনার সূত্রপাত হইল। Visions of the Past নামে খণ্ড খণ্ড কবিতা এবং Captive Ladie নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য প্রকাশিত হইল। গৌরদাস বসাক ছিলেন মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মধুসূদন তাঁহাকে একখণ্ড Captive Ladie পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত ও একজন সুপণ্ডিত ইংরেজের অভিমত জানাইতে বলিয়াছিলেন। গৌরদাসের পরামর্শে মধুসূদন স্বনামধন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে একখণ্ড Captive Ladie উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। মহামতি বেথুন এইরূপ অভিমত জানান,—'ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে তিনি যে প্রতিভা ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যদি তিনি তাঁহার স্বদেশের কাব্যসাহিত্যের মান উন্নয়নে নিযুক্ত করিতেন, তবে তাঁহার দেশের পরম উপকার করিতেন এবং নিজেও অক্ষয় কবিকীর্তি অর্জন করিতে পারিতেন।' গৌরদাস পূর্বেও তাঁহাকে বাংলা ভাষায় কাব্যানুশীলনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। এখন বেথুন সাহেবের এই উপদেশ-বাণী তাঁহার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি বাংলা-সাহিত্য-চর্চায় তাঁহার সমস্ত উৎসাহ, মনোযোগ ও পরিশ্রম নিয়োজিত করিলেন। তিনি পূর্বেই গ্রীক, হীব্রু, ল্যাটিন শিক্ষা করিয়াছিলেন, মাদ্রাজে সংস্কৃত এবং তামিল, তেলেগু প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাও শিক্ষা করিলেন। সমস্ত বিদ্যাই তিনি মাতৃভাষার অর্চনায় অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিলেন।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে রচনাদর্শ তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে আমদানি করিলেন, সেটি হইতেছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল কয়েকটি বিষয়ে আধুনিকতার সূত্রপাত করিলেও তাঁহারা কাব্যের প্রাচীন রচনারীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ছন্দ ছিল পয়ার ও ত্রিপদী। ইহাতে চরণে চরণে ছিল মিল। মধুসূদন পয়ারের মিল উঠাইয়া দিয়া, যেখানে একটি ভাব সম্পূর্ণ হইল সেখানেই যতি বা বিরামচিহ্ন স্থাপন করিলেন। ইহাতে চরণশেষে আর বারবার থামিবার প্রয়োজন হইল না। ইহাতে ছন্দ হইল মুক্ত ও প্রবহমাণ এবং

ভাবপ্রকাশে আসিল স্বাভাবিক সাবলীলতা। মধুসূদন পূর্বতন পয়ার ছন্দের কাঠামোকেই ভিত্তি করিয়া ইংরেজ কবি মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের আদর্শে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের রূপ দিলেন। তার পর বিচিত্রধ্বনিময় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে চলিতভাষার মিশ্রণে এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ পদকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া এমন একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়িয়া তুলিলেন যে ঐ ছন্দই হইল বীর, করুণ প্রভৃতি সমস্ত ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত বাহন। বাংলা কাব্যে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনের এক অভিনব দান।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব'। ইহা মহাভারতের সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং চারি সর্গে বিভক্ত। 'তিলোত্তমাসম্ভব' আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—পয়াব ত্রিপদীর গতানুগতিক কাব্যধারার পরিবর্তন করিয়া নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করা যায় কিনা তাহাই পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষার স্তরে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি সর্বত্র সমান ভাবে দেখানো সম্ভব হয় নাই। তবে কবি যে পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যেব ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন ইহা বেশ বুঝা যায়।

'মেঘনাদবধ' কাব্য মধুসূদনের প্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। ইহাব মূল কাহিনী রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও চরিত্রচিত্রণে তিনি অনেকক্ষেত্রে নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রীসের প্রাচীন কবি হোমার, ইতালীর প্রাচীন কবি ভার্জিল, ওভিদ্, ট্যাসো, দান্তে, এবং ইংলণ্ডের কবি মিল্টনের প্রভাব পড়িয়াছে এই কাব্যের মধ্যে স্থানে স্থানে। মধুসূদন ভারতের বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মহাকবিগণের মিলন সাধন করিয়াছেন মেঘনাদবধ কাব্যে। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যগুলির সু-উচ্চ ভাব ও মনোমুগ্ধকর চিত্রাবলী সযত্নে আহরণ করিয়া মেঘনাদবধ-রূপ 'মধুচক্র' নির্মাণ করিয়াছেন।

এই কাব্যের প্রথমেই কবি কল্পনাদেবীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মধুকর যেমন নানা পুষ্পোদ্যান হইতে ফুলের মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করে, মধুসূদনও সেইরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির বিচিত্র ভাবরাজি সংগ্রহ করিয়া এই মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিবেন—ইহাই তাঁহার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। মেঘনাদবধ কাব্যে কবির এই কাব্যরচনার আদর্শ সফল হইয়াছে। ইহাতে সত্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাকবিগণের উৎকৃষ্ট ভাব-কল্পনার সমাবেশ হইয়াছে। এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সম্মিলনেই জন্মলাভ করিয়াছে বাংলার নবযুগের নূতন মহাকাব্য।

মধুসূদন এই কাব্যের প্রথমে সরস্বতী-বন্দনায় বলিয়াছেন,—

গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত।

কবির মনে বীররসাত্মক কাব্যরচনার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও এই কাব্যে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। ইহা মূলত একখানি করুণরসাত্মক কাব্যে পরিণত হইয়াছে। রাবণের বিলাপ দিয়া ইহার আরম্ভ এবং রাবণের বিলাপেই ইহার সমাপ্তি। কিন্তু তবুও দেখা যায় সমস্ত রসেরই অপূর্ব প্রকাশ হইয়াছে এই কাব্যে। এই মহাকাব্য নয়টি সর্গে বিভক্ত। সপ্তম সর্গে পুত্রহন্তা লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে রাবণের যুদ্ধযাত্রা ও লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপের বর্ণনায় স্থানে স্থানে বীররস চমৎকার ফুটিয়াছে। রাবণের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা এইরূপ,—

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগারি

বিস্ফুলিঙ্গ, তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ, হেরি রক্ষোনাথে।

লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল-নিক্ষেপের বর্ণনা এইরূপ,—

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি। বজ্রনাদে উঠিলা গর্জিয়া,
উজলি অম্বরদেশ সৌদামিনী রূপে
ভীষণ রিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেবনর। ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝনুঝনি
দেব-অস্ত্র; রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িল সুমতি।

প্রমীলার চরিত্র মধুসূদনের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ইহাতে বঙ্গনারীর কোমলতা ও পতিপরায়ণতা এবং পাশ্চাত্ত্য বীরনারীর রুদ্রতেজ একাধারে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যান হইতে লঙ্কাপুরী ফিরিবার বাসনা করিলে সখী বাসন্তী জানাইল—

কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজ তুমি? অলংঘ্য সাগর
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃঅরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।

তখন প্রমীলা রোষদৃপ্ত কণ্ঠে বলিল,—

কি কহিলি, বাসন্তি! পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে, সে রোধে তার গতি?

দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি !

চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনে একটা অপূর্ব গীতি-কবিতার সুর আমাদিগকে মুগ্ধ করে।—

ছিনু মোরা, সুলোচনে ! গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী ; মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।...
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি ;
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ।

এই মেঘনাদবধকাব্যের সমসাময়িক কালেই রচিত হয় 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য। ইহা বৈষ্ণবপদাবলীর আদর্শে পরিকল্পিত রাধা-বিরহ অবলম্বনে রচিত কাব্য। ইহা বৈষ্ণবপদাবলীর মত গানের জন্য রচিত নয়। ব্রজাঙ্গনা পূর্বতন মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, কিন্তু ইহার ভাষা ও ছন্দ মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি।

ইহার পর মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়। ইতালীর কবি ওভিদের অনুসরণে তিনি এই পত্র-কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ওভিদের মতই তিনি একুশখানি পত্র-রচনা করিবেন, কিন্তু এগারটির বেশি লিখিতে পারেন নাই। ওভিদকে অনুসরণ করিলেও এই পত্রের লেখিকারা সকলেই ভারতীয় পুরাণের নারী-চরিত্র। ভারতীয়

রমণীর নিজস্ব ভাবানুভূতি, তাহার মাধুর্য ও তেজস্বিতা—তাহার সরলতা ও দুর্বলতা, তাহার সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যে এই পত্র-কাব্যে। মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য ও ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য সম্মিলিত হইয়াছে বীরাঙ্গনায়। অমিত্রাক্ষব ছন্দ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে মধুসূদনের হাতে এই রচনায়। পত্রগুলিব মধ্যে একটি নাটকীয় রসের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। অনেক পত্রের আরম্ভ নাটকীয় ভাবে,—

> বাজিছে রাজতোরণে রণবাদ্য আজি ;
> হ্রেষে অশ্ব ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
> রাজকেতু, মুহুর্মুহু হুঙ্কারিছে মাতি
> রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
> সাজিছ কি নররাজ, যুঝিতে সদলে
> প্রবীর পুত্রেব মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে ?
> নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?

পত্রকাব্য যেমন মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে প্রথম আমদানি করেন, সেইরূপই আমদানি করেন 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদাবলী' কবিতা। চৌদ্দ চরণে সম্পূর্ণ এক-একটি কবিতার মধ্যে কবি-চিত্তের নিগূঢ় আবেগ এবং কামনা-বেদনা সুসংহতভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কাব্যের এই বিশিষ্ট রূপটি পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। মধুসূদনের সনেট-রচনার উপর ইতালীর কবি পেত্রার্ক ও ইংলণ্ডের কবি মিল্টনের প্রভাব লক্ষিত হয়। কবি কেবল কবিতার আঙ্গিকই গ্রহণ করিয়াছেন ইঁহাদের নিকট হইতে, কবিতার বিষয়বস্তু ও রসসৃষ্টি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তিনি যখন সুদূর ফরাসী দেশে ছিলেন, তখন নিজের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাঁহার পরিচিত নদ-নদী, আকাশ-বাতাস, বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংস্কার প্রভৃতি নূতন রূপে ও নূতন রসে তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করে। জন্মভূমির কপোতাক্ষ

নদ, বউ-কথা-কও পাখী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কমলে কামিনী, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, গঙ্গাতীরের দ্বাদশ শিবমন্দির, ঈশ্বরী পাটনী, বিদ্যাসাগর, বিজয়া দশমী, প্রভৃতি অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া তাঁহার স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এইসব স্মৃতির রূপায়ণই চতুর্দশ-পদাবলীর বিষয়বস্তু। বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করিলেও এবং বিদেশী সাহিত্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিলেও মধুসূদন তাঁহার বাঙালীত্ব ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ছিল মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রেম, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, বাঙালীর সমস্ত রস-সংস্কার ও ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র একটি কবিতা কবির গোপন হৃদয়ের গূঢ় অনুশোচনাকে রূপায়িত করিয়াছে—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়-মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ;—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদন যে আখ্যায়িকামূলক এবং বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্য-রচনার ধারা প্রবর্তন করেন হেমচন্দ্র প্রধানত সেই মহাকাব্য রচনার ধারাই অনুসরণ করেন। কবি হিসাবে হেমচন্দ্র মধুসূদনেরই উত্তরাধিকারী—তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য। কিন্তু গুরুর মত তিনি উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তাই তাঁহার কাব্যপ্রচেষ্টা সার্থক শিল্প-সৌন্দর্যে রূপায়িত হয় নাই।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী'। ইহাতে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের রচনারীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী রচনা 'বীরবাহু কাব্য'। এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন,—'উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ-রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।' এই কাব্যে কবির স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাবোধ হিন্দু-বীরবৃন্দের শৌর্য-বীর্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে। বীরবাহু কাব্যের পরে হেমচন্দ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লেখেন। সেগুলি 'অবোধবন্ধু' 'এডুকেশন গেজেট' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; পরে সেগুলি 'কবিতাবলী' নামে কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। ইহার মধ্যে 'ভারত-সংগীত' সর্বজন-সমাদৃত কবিতা। দেশপ্রেমের এমন আবেগময় ও উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিরল। বাঙালীর জাতীয়-চেতনার উদ্বোধনে এই কবিতাটির প্রভাব অপরিসীম। অতীত গৌরব স্মরণ করাইয়া কবি ভারতের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন,—

বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আরব্য মিশর, পারস্য, তুরকী
তাতার তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

মাইকেল মধুসূদনের অনুসরণে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে হেমচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত মহাকাব্য 'বৃত্রসংহার' রচনা করেন। মেঘনাদবধে মধুসূদনের আদর্শ ছিল হোমার, দান্তে, ভার্জিল, ট্যাসো, মিল্টন প্রভৃতি ; বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্রের আদর্শ ছিল মধুসূদনের মেঘনাদবধ। সেইজন্য তাঁহার বৃত্রসংহারে মেঘনাদবধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাবণের সঙ্গে বৃত্রের, মেঘনাদের সঙ্গে রুদ্রপীড়ের, প্রমীলার সঙ্গে ইন্দুবালার, রামের সঙ্গে ইন্দ্রের, সীতার সঙ্গে শচীর এবং সরমার সঙ্গে চপলার বিশেষসাদৃশ্য আছে। কিন্তু দুইটি বিষয়ে হেমচন্দ্র গুরু মধুসূদনকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন ; একটি—কাব্যের আখ্যায়িকা নির্বাচনে, অপরটি —কাব্যের কাঠামোর সুদৃঢ় বন্ধনে। হেমচন্দ্রের আখ্যান-বস্তু একটি লোকোত্তর মহিমা ও মহান গাম্ভীর্যে মণ্ডিত। ইহা মেঘনাদবধ অপেক্ষা অধিকতর মহাকাব্যের উপযোগী। তারপর বৃত্রসংহারের আখ্যানবস্তুর বাঁধুনিও চমৎকার, কোথাও একটা অনাবশ্যক বা অসংবদ্ধ অংশ নাই। মেঘনাদবধে আখ্যানবস্তুর বাঁধুনি ইহা অপেক্ষা শিথিল। কিন্তু কবির যে সৃজনী প্রতিভা ধূলামুঠিকে সোনামুঠিতে পরিণত করে, হেমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অমিতাক্ষরের উদাত্ত ধ্বনি-সংগীত তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাই বৃত্র-সংহারে তাঁহার অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ার মাত্র। তাঁহার ভাষা নীরস ও গদ্যঘেঁষা, রচনাবিন্যাস আড়ষ্ট ; রচনায় কবিত্ব, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব দেখা যায়। এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও বৃত্রসংহার একখানি বিশেষ স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধের পরেই

দ্বিতীয় মহাকাব্যের গৌরবের অধিকারী। দেবাসুরের যুদ্ধের একটি বর্ণনা এইরূপ,—

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে,
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ,
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সংকল্প উভ দেবতা-দনুজে।

বৃত্রসংহার ছাড়া হেমচন্দ্র 'আশাকানন, 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি রচনা করেন। দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহার উদ্বোধনেই তাঁহার কবি-কৃতি প্রকৃত সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রের পরে যিনি মহাকাব্য-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্রের উপর হেমচন্দ্রের কোন প্রভাব নাই, কিন্তু ভাষার দিক দিয়া নবীনচন্দ্রের কাব্যে মধুসূদনের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সমসাময়িক জনচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া জাতীয়তা-চেতন বাঙালীর উপর ইহা অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই কাব্যটিকে ঐতিহাসিক গাথাকাব্য বা লিরিকধর্মী খণ্ডকাব্য বলা যায়। ইহার বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের চরমতম দুর্ভাগ্যের কাহিনী জড়িত। পলাশীর প্রাঙ্গণে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর প্রভৃতির

বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রে স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়। এই জাতীয় দুর্ভাগ্যের বেদনা ও আক্ষেপ কবি জ্বালাময়ী ভাষায়, সুতীব্র আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে। সমস্ত কাব্যখানির মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রাণস্পন্দন পাঠকচিত্তকে উন্মথিত করিয়া তোলে।

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

নবীনচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার তিনখানি মহাকাব্য—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস'। বৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা এবং প্রভাসে অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যত্রয়ী একই মহাকাব্যের তিনটি অংশ। প্রথম অংশের মূল ঘটনা সুভদ্রা হরণ, দ্বিতীয় অংশের অভিমন্যুবধ, তৃতীয় অংশের যদুবংশ-ধ্বংস। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কবি মহাভারতের মূল ভাবের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রকে নূতন রূপে সাজাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন, তিনি মানবতার পূর্ণ আদর্শ। জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ তিনি। আর্য-অনার্যের ভেদ, গৃহবিবাদ, কর্মের কলহ প্রভৃতি, জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্মের সমস্ত বিভেদ, নিষ্কাম কর্ম ও প্রেমের দ্বারা দূর করিয়া, একজাতি, এক-রাষ্ট্র ও একধর্মের বন্ধনে, এক অখণ্ড হিন্দু-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

করাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের নির্দিষ্ট কর্ম। এই মহামানব শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা,—

বাঁধি ধর্ম-নীতিপাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদজ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব মর্ম,—
এক জাতি, এক ধর্ম,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন—
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে আর্তসেবাপরায়ণা সুভদ্রার মূর্তিটি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে।—

ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
রোগে শান্তি দুঃখে দয়া শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ।

শ্রীকৃষ্ণের মত যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণও এই সাম্যবাদ ও প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'অমিতাভ' নামে বুদ্ধের জীবনীকাব্য, 'অমৃতাভ' নামে চৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী এবং 'খৃষ্ট' নামে যীশুর জীবনী তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও 'রঙ্গমতী' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের প্রকাশই বেশি আছে। শিল্পসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির দিক দিয়া এগুলি বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, মিত্রাক্ষরেও অনেক শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনাও স্থানে স্থানে গাম্ভীর্যহীন শিশুজনোচিত হইয়াছে। তবে নবীনচন্দ্রের রচনায় একটা অফুরন্ত গতিবেগ ও প্রাণ-প্রাচুর্য আছে, তাহাই পাঠককে আকর্ষণ করে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্য দিয়া যে মহাকাব্যরচনার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিল, বিহারীলাল সে কাব্যধারাকে অনুসরণ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যগুরু বিহারীলাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্য-শিক্ষিত কবিদের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকে গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের মনে নিজের মনের কথা বলিলেন।' কবি বিহারীলাল তাঁহার আত্মগত ভাব-কল্পনা ও অনুভূতিকেই একান্তভাবে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকাব্য-ধারার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে অন্তর্মুখী রোমান্টিক কবিতা রচনার যে সূর্যোদয় হইয়াছে বিহারীলালের কণ্ঠে সেই প্রভাতের আগমনী গান প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে।

রোমান্টিক গীতি-কবিতার কবি এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনন্ত বিস্ময় ও অসীম রহস্য অনুভব করেন। বিশ্বের অন্তরে আছে এক রহস্যময়ী ও সৌন্দর্যময়ী সত্তা। সেই সৌন্দর্যময়ী দেবীর শক্তি বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য, প্রেম ও রসের মূল উৎস সেই অজানা রহস্যময়ী।

ইহা একটি বিশিষ্ট কল্পনাভঙ্গী। ইহার ফলে কবি দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অদৃশ্যশক্তির ছায়াপাত দেখেন, জড়ের মধ্যে চিন্ময়ের রহস্যলীলা উপলব্ধি করেন, অপূর্ণের মধ্যে পূর্ণতার সন্ধান পান। সেইজন্য এই কাল্পনিক মানসপ্রতিমা, এই মানস-সুন্দরীকে পাইবার উদ্দেশ্যে, একটা আদর্শ অখণ্ডতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিবার জন্য এই কবিরা সর্বদাই

ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কাব্যে প্রায়ই থাকে একটা না-পাওয়ার বেদনা, একটা বিষাদের সুর।

বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যে এইরূপ রোমান্টিক গীতিকবি। বিশ্বসৃষ্টির সকল সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম ও জ্ঞানের দেবীই তাঁহার 'সারদা'। সমগ্র কাব্য সাধনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার 'সারদা'র, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিতা এই মায়াময়ীর আরাধনা করিয়াছেন। তাঁহার 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এই সারদার বন্দনাগানে মুখরিত হইয়াছে। সারদাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

কে তুমি, প্রাণেতে পশি,
ত্রিদিবের পূর্ণশশী,
কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপ ললনা?
করি অপরূপ আলো
কি বিচিত্র খেলা খেল!
না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে
এ অসার দেহ-যন্ত্রে
আপনি বিদ্যুৎবেগে বেজে উঠে বাজনা!
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা?
তোমারি এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি,
তোমার কিরণ-জাল
ভুবন করেছে আলো,
গ্রহতারা শশী রবি,
তোমারি বিম্বিত ছবি,
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি।
মোহিত হইয়া ত্যাখে ভক্তিভাবে ধরণী।

বিহারীলাল-প্রবর্তিত এই রোমান্টিক কাব্য-কবিতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথে।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলায় এক পরম বিস্ময়কব এবং অশেষ-গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে, বাঙালীর চিন্তাধারা ও ভাবানুভূতিতে, তাহাব সাহিত্যরসবোধে এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যাট বৎসরের অধিককাল রবীন্দ্রনাথের লেখনী কাব্য, সংগীত, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কথিকা, ধর্মতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়াছে। ভাষার অপূর্ব কারুকার্যে, ভাবের বিচিত্র লীলায়, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে, শ্রেষ্ঠ-শিল্পিজনোচিত রসসৃষ্টিতে, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অপরূপ বিলাসে সেগুলি বাংলা সাহিত্যেব পাঠককে একান্ত মুগ্ধ ও বিস্ময়-বিহ্বল করিয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাব, রস, রুচি, ভঙ্গী ও বাক্যরীতি সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালীর চিন্তা-জগৎ বহু প্রসারিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে আসিয়াছে বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা এবং তাহার অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোকে এই জড়জগৎ ও মানবজীবনকে আমরা নূতন কবিয়া চিনিয়াছি। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাধারায় লাভ করা গিয়াছে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের রসবোধের আদর্শ ও সাহিত্যিক রুচি হইয়াছে যথেষ্ট উন্নত ও পরিমার্জিত। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর মানসলোকে রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতভাবে আনিয়াছেন—সর্বকালীন মানবসত্যের রূপ, বৃহৎ ভাব ও আদর্শের অনুপ্রেরণা, মনুষ্যত্বপূজার মনোবৃত্তি এবং অলৌকিক সৌন্দর্যধ্যান তাঁহাকে ঘিরিয়া কাব্য, সংগীত, চিত্র, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারু-শিল্পের এক নূতন ধারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের আচার-

ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায়, বসন-ভূষণে, গৃহে, সভা-বৈঠকে, সর্বত্রই যেন একটা নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই বাঙালী-জীবনের এই নবযুগের স্রষ্টা।

বাঙালীর নিজস্ব ভাব-চিন্তা, তাহার আদর্শ ও মানস-সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন এবং বিশ্বমুখী করিয়াছেন। উহাদিগকে তিনি চিরন্তন নীতি ও আদর্শ এবং শাশ্বত সত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের সর্বজনীন মহান্ আদর্শ ও উচ্চ নীতির কষ্টিপাথরে তিনি দেশ ও জাতির ভাবাদর্শ ও সংস্কার-প্রথাকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সর্বদাই খণ্ডকে, বিচ্ছিন্নকে এড়াইয়া পরিপূর্ণতার দিকে, অখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টা ও ভাবাদর্শে।

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যকে প্রধানত এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়,—কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, গদ্য প্রবন্ধাদি এবং গান।

কাব্য: রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেই ঠাকুর-পরিবার জ্ঞানে, বিদ্যায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পকলায়, সকল প্রকার প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনে বাংলা দেশে ছিল অগ্রণী—পথপ্রদর্শক। সেখানে সাহিত্যের আবহাওয়া ছিল ঘন। কাব্যপাঠ ও সংগীতচর্চা নিয়মিত হইত। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, আর এক ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন নাট্যকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—'ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বইত।' এই সাহিত্য ও সংগীতের আবহাওয়ায় তাঁহার মানস-জীবন পরিপুষ্ট হওয়ায় অতি অল্পবয়সেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ হয়। তের-চৌদ্দ বৎসর হইতেই কবি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় 'বনফুল' নামে এক দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য বা কাব্যোপন্যাস রচনা করেন। বালক-কবির ভাষা ও ছন্দের উপর দখল এবং কবিত্বশক্তির নমুনা এখানে দেওয়া যাইতেছে। তাঁহার

কাব্যের নায়িকা কমলা বনভূমির পশুপক্ষীকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট অনুভব করিতেছে,—

হরিণ সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি,
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ রহিব কোথায়?

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকখানি এইরূপ আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে ব্রজবুলি-মিশ্রিত খণ্ড খণ্ড কবিতাও রচনা করেন। তাহার পর 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব গীতিকাব্য-রচনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কবি বলিয়াছেন,—'সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।··সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে।'

'সন্ধ্যাসংগীতে'র মূল ভাব বেদনাবোধ। ইহার মধ্যে একটা বিষাদ, অতৃপ্তি ও হুতাশার সুর বাজিতেছে। কবির অন্তরের সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের মিলন না হওয়ার জন্য—আদর্শ ও বাস্তবের অসামঞ্জস্যের জন্য এই বেদনা। 'প্রভাতসংগীতে' কবি মনের এই অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইলেন। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সহজ যোগ স্থাপিত হইল।—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি কবি-প্রতিভারই জাগরণ। 'ছবি ও গানে' কবি সহজ আনন্দে প্রকৃতি ও মানবজীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন।

'কড়ি ও কোমলে' কবি একেবারে মানবজীবনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার ভালমন্দ, সুখদুঃখকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিলেন।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ উদয় দেখা যায়। এই কাব্যগ্রন্থে কবি প্রেমের বিচিত্র লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাও কতকগুলি আছে।

ইহার পর কবির কাব্যে এক নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইল, কাব্য এক অভিনব অত্যুজ্জ্বল রূপ ধারণ করিল। রবীন্দ্রনাথের উপর পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে শিলাইদহ, শাহ্‌জাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসর প্রভৃতি মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে হইত। এই সময় বাংলার নগ্ন পল্লীপ্রকৃতির অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য তিনি আকণ্ঠ পান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পল্লীর নরনারীর সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল নিবিড়। তাহারই ফলে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যের সুতীব্র অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে এই সুখদুঃখপূর্ণ ক্ষণিক মানবজীবনের উপর প্রবল আসক্তি কবি অনুভব করিয়াছিলেন। এই বিশ্বসৌন্দর্যের অখণ্ড রূপের প্রতি কবির একটা নিরুদ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও এই ধরণী ও মানবজীবনের উপর তীব্র আকর্ষণ এই দুইটি ভাব গঙ্গাযমুনার মত পাশাপাশি প্রকাশ পাইয়াছে এই সময়কার কাব্য-গ্রন্থগুলিতে—'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি'তে। এই সময়কে অনেকে রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠযুগ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা তাঁহার অন্যতম সাহিত্যকীর্তি 'গল্পগুচ্ছে'রও যুগ। কবি এই ধরণীর সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্যবন্ধন—একাত্মতা অনুভব করিতেছেন,—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে

অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

এই সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-বিষয়ক কবিতার ধারা চলিয়াছে 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় কবি বৃহত্তর আদর্শেব জন্য, আধ্যাত্মিক সাধনাব জন্য নূতন পথে যাত্রা করিতে সংকল্প করিতেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে প্রাচীন ভারতের আদর্শের জয়গান করা হইয়াছে। তাহার পরবর্তীযুগের কাব্যে কবির ভগবদনুভূতির বিচিত্র রূপ ও রস আমরা দেখিতে পাই। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' এই যুগের কাব্য। ভগবানের সহিত কবির বিচিত্র রসলীলার এই কবিতাগুলি পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয়। প্রধানত এইসব কবিতার জন্যই তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন।

ইহার পর 'বলাকা' কাব্যে কবির এক নূতন ভাব-কল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিরন্তর গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তির প্রকাশ এবং যৌবনের গতিবেগের মধ্যেই মানবজীবনের সত্যকার পরিচয় নিহিত— ইহাই বলাকা কাব্যের মূল সুর। পরবর্তী কাব্য 'পূরবী'তে কবি আবার ধরণীর ধূলামাটির উপর ও মানুষের স্নেহ-প্রেম, হাসি-কান্নার মধ্যে নামিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় সে জীবনের পরিপূর্ণ উপভোগ কবির পক্ষে সম্ভব হইল না। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পরিশেষ', 'বীথিকা', 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' প্রভৃতিতে সৃষ্টির গতি ও প্রকৃতি, মানবের প্রকৃত স্বরূপ, কবির অতীত জীবনের পর্যালোচনা ও স্মৃতিরূপায়ণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপ, অনিত্য জগৎ

ও জীবনে নিত্যের লীলার রহস্য ও বিস্ময় প্রভৃতি নানা চিন্তা ও বিচার কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

১৩৪৪ সালে কবি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। লুপ্তচেতন কবি একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশ হইতে জীবনে ফিরিয়া আসেন। মৃত্যুর এই অভিনব অভিজ্ঞতার আলোকে কবি জীবনের স্বরূপ, স্বচ্ছ ও স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। 'প্রান্তিক' হইতে 'সেঁজুতি', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা'র মধ্য দিয়া এই শেষযুগের কাব্যধারাটি অগ্রসর হইয়াছে। উপনিষদের ঋষিদের পথে রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জান—এই যুগের কাব্যের মূল সুর।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা নাম দিয়া কাব্যের এক নূতন রচনারীতি প্রবর্তন করেন। ইহাতে ছন্দের সুনিয়মিত ধ্বনিবিন্যাস বা অন্ত-মিল নাই। 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে কবি এই নূতন আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালের অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে এই মিলহীন গদ্যছন্দে কবিতা লিখিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ রচনার নিদর্শন দেওয়া গেল,—

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।
মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

নাটক : রবীন্দ্রনাথ ছোট-বড় চল্লিশখানারও অধিক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলিকে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়,—গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডি-সদৃশ নাটক, রূপক-সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, কৌতুকনাট্য,

ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' তাঁহার গীতিনাট্য। পাত্রপাত্রীর বক্তব্য নানাসুরের গানকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি কাব্য নাট্য-শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে কাব্যাংশ প্রাধান্যলাভ করিলেও নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অভাব নাই। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী' নাটকে আমরা পাশ্চাত্ত্য বিয়োগান্ত নাটকের মত একটা ভাব দেখিতে পাই। তবে ইহাদের মধ্যে গীতিকাব্যের সুরটিই বেশি বাজিয়াছে। আর রবীন্দ্রনাথের প্রায় নাটকই কবি-মনের একটি নির্দিষ্ট ভাব বা তত্ত্বের বাহন। 'বিসর্জন' বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির অন্যতম। ইহারও নাটকীয় দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে —প্রেম ও প্রতাপ, অন্ধ ধর্মসংস্কার ও হৃদয়ধর্ম বা মানবধর্মের মধ্যে। রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব শিল্পসৃষ্টি কবির একান্ত নিজস্ব অবদান। এ-জাতীয় নাটক রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি এই পর্যায়ের নাটক। রূপক ও সংকেতের সাহায্যে মানবহৃদয়ের গূঢ়তম ভাবানুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করা হইয়াছে এইসব নাটকে। সামাজিক নাটকের মধ্যে 'শোধবোধ' ও 'বাঁশরী' এবং কৌতুকনাট্যের মধ্যে 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' উল্লেখযোগ্য।

গল্প ও উপন্যাস ঃ সর্বতোভিমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি দিক তাঁহার প্রতিভার স্বর্ণ-কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা কথাসাহিত্যেও তাঁহার দান অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হইয়াছে—এ-কথা বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের করস্পর্শে এইবার সাহিত্যের এই দুইটি শাখা অধিকতর

উন্নত ও উজ্জ্বল হইল। বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃত জন্মদাতা তিনি। তাঁহার হাতেই বাংলা ছোটগল্প সর্বপ্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। তিনি বাংলা সাহিত্যে অজস্র সার্থক ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন। ভাবের গভীরতায়, অনুভূতির স্বচ্ছ ও সার্থক রূপায়ণে, অপূর্ব রসপরিণতিতে এই গল্পগুলি, শুধু বাংলার নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। প্রায় গল্পেই তিনি আমাদের সাধারণ জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার নিপুণ চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার মানব-প্রেমিক অন্তরের সমস্ত সুধা বর্ষণ করিয়া তাঁহার গল্পের নর-নারী-শিশুকে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছেন। আমাদের বাঙালী-জীবনের ক্ষুদ্র ঘরের কোণে, নদীর ঘাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, হাটে-মাঠে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত স্থানে, যাহারা সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া দিনযাপন করিতেছিল, সামান্য ক্ষোভে, আনন্দে স্পন্দিত হইতেছিল, কবিচিত্তের অপূর্ব ভাব-রসে সিঞ্চিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহারা অসাধারণ ও মাধুর্যময় হইয়া উঠিল। আমরা দেখিলাম, গভীর মানবীয় অনুভূতিতে, হৃদয়ের ভালবাসা-অনুরাগে, ত্যাগে ও আদর্শে তাহারা বিশ্বের সকল মানবের সঙ্গে সমান আসনে উন্নীত। ব্যাপক ও গভীর বিশ্বজনীন মনোভাব তাঁহার প্রায় প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিন খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ', 'গল্পসল্প', 'তিনসঙ্গী', 'সে' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সমস্ত ছোটগল্পগুলি সংকলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু ছোটগল্প লিখিয়াই তাঁহার সাহিত্য-কর্ম শেষ করিতেন, তবুও তিনি বিশ্ব-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিশ্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ হইলেও তাঁহার এই ছোটগল্পগুলি বাঙালীর ঘরের কথা, তাহার পারিবারিক জীবনের কথা, সমাজের কথা, ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছে। 'দেনা-পাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' প্রভৃতি গল্পে আমাদের সমাজের নির্মম ও হৃদয়হীন রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ব্যক্তিজীবনের প্রেম, ভালবাসা, হাসি-কান্না, স্নেহমমতা,

বিবাদ-বিসংবাদ রূপ পাইয়াছে—'দুবাশা', 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', 'নষ্টনীড়', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে। অতি-প্রাকৃত বিষয় লইয়াও রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা করিয়াছেন,—যেমন 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্প। প্রতিটি গল্পই তাঁহার শক্তিশালী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

উপন্যাস-রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় অপরিসীম। তাঁহার মনোবিশ্লেষণ-ধর্মী উপন্যাস 'চোখের বালি' আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পথ-রেখা নির্দেশ করিয়াছে। মনস্তত্ত্বের জটিলতা-বিশ্লেষণ ও ঘটনাস্রোতের আন্দোলনে মানসিক সংঘাত-সৃষ্টি—ইহাই আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। বাংলা উপন্যাসে এই পথ-রেখা রবীন্দ্রনাথ হইতে সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তীকালের অনন্যসাধারণ সার্থক ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের হাতে ইহার আরও বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। উপন্যাস-রচনায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য। 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রভাব তাঁহার উপর অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংকেতিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। প্রথমজীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব তাঁহার উপর ক্রিয়াশীল ছিল। এই সময় তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। পরবর্তীকালে সামাজিক উপন্যাস রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন। সামাজিক উপন্যাসেই তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ', 'গোরা' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস।

প্রকৃত বাস্তবধর্মী উপন্যাস-রচনার পথ-প্রদর্শক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি স্বাভাবিক ভাবে মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও ভাব-কল্পনা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অহেতুক নীতি-প্রচার তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। সর্বত্রই মানুষের অন্তরের চিরন্তন সত্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সামাজিক বা ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া রচনা অবাস্তব বা নীতিমূলক করেন নাই। কোথাও কোথাও তিনি গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক

সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছেন। 'গোরা' উপন্যাসে তিনি দেশাত্মবোধ ও সর্বজনীন মানবত্বের জয়গান গাহিয়াছেন। 'চার অধ্যায়ে' স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লববাদের প্রকৃত পরিণতি তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে যে মানুষ, তাহারই আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার পরিচয় দিতেই তিনি সদা-উদ্‌গ্রীব।

প্রবন্ধ-সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ও পত্রাবলী **:** বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যও রবীন্দ্র-প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের পরিসরে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনা, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা, রাষ্ট্রীয় সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, ইতিহাস, শিক্ষা, কাব্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। রচনা-ভঙ্গী, ভাব ও শিল্পনৈপুণ্যে এই বিপুল প্রবন্ধ-সম্ভার বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

যে যাদুকরী প্রতিভায় তিনি সাহিত্যের অন্যান্য শাখা স্বর্ণোজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই অপূর্ব শিল্পপ্রতিভায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ ও উন্নত করিয়াছেন। প্রবন্ধ-সাহিত্যও যে সৃষ্টিশীল-সাহিত্য-পদবাচ্য, এই অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই লাভ করা যায়। শুধু নীরস তত্ত্ব ও যুক্তির আলোচনা নয়, সৌন্দর্য ও রসের ক্ষেত্রেও প্রবন্ধ যোগ্য আসন লাভের অধিকারী, এই নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজস্র রচনায় রাখিয়া গিয়াছেন। রস, ভাব ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আলোচনা পাঠকের সম্মুখে উত্থাপন করেন। রস-পরিবেশনই এইসব রচনার মুখ্য লক্ষ্য, গৌণ নহে। তাই সর্বত্রই অতুলনীয় বাগ্-বৈভব, হৃদয়ের অফুরন্ত রসানুভূতি ও অপূর্ব মননশীলতায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁহার হাতে অপূর্ব শিল্পসুষমা লাভ করিয়াছে।

তাঁহার জাতীয় আদর্শ ও সমস্যা-মূলক প্রবন্ধপুস্তকের মধ্যে 'কালান্তর', 'সমাজ', 'স্বদেশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলিতে

তিনি বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় সমস্যার আলোচনা করিয়া তাহার সংস্কারের পথ-নির্দেশ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সম্পর্কিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। বর্তমানে যে পাঠ্য-প্রণালী দেশে প্রচলিত, জাতীয় জীবনের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব; ইহাতে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ নাই। তাই তিনি, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে পরিচালিত হউক, এই দাবী করিয়াছেন। তাই এই শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও আদর্শের পরিচায়ক।

ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গেও তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি প্রবন্ধপুস্তকগুলি, শুধু সাহিত্য-আলোচনাতেই নয়, প্রকৃত সাহিত্য-রসসৃষ্টিতেও অগ্রগণ্য। ইহাদের সৌন্দর্যানুভূতি ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের তুলনা বিরল। তিনি কতকগুলি জীবন-কথাও লিখিয়াছেন। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে তিনি আমাদের দেশের কয়েকজন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'জীবন-স্মৃতি'—তাঁহার আত্মজীবনী। এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য গদ্যরচনার অপূর্ব নিদর্শন।

কৈশোর হইতে প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবি নানা সময়ে নানা লেখায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'যাত্রী', 'জাপানযাত্রী', 'পথের সঞ্চয়', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার স্বচ্ছ অনুভূতি, গভীর মানবপ্রীতি, জীবন ও জগতের বিচিত্র খবর জানিবার আগ্রহ, অপূর্ব কৌতুকানুভূতি প্রভৃতি এই সমস্ত রচনায় সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। তাঁহার যে সুদূর-পিয়াসী মন সর্বদা ঘরের বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য পাগল, সেই বৈরাগী মনের স্পর্শ সহজেই পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হয়। রচনাগুলি পাঠ করিলে বিভিন্ন

দেশের পরিবেশ, মানুষ, তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, রীতিনীতি, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আর একটি অনন্যসাধারণ দান তাঁহার পত্র-সাহিত্য বা পত্রাবলী। নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে নানা লোকের কাছে লেখা চিঠিপত্রও যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হইতে পারে, তাহা এই প্রথম আমরা জানিলাম। এ-অভিজ্ঞতা বাঙালী পাঠকের কাছে নূতন। অতি সামান্য পত্রের মধ্যে তিনি সাহিত্যের রস-পাত্র উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। সামান্য বা গভীর বিষয় লইয়া নানান লোকের কাছে লেখা এই অসংখ্য পত্রগুলি নিত্যকালের সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া আছে। পত্রগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। পত্র-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', চিঠিপত্র' উল্লেখযোগ্য।

গানঃ রবীন্দ্র-সংগীত সংগীত-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এইগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ ও বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা কয়েক সহস্র। ভগবৎপ্রেম, প্রকৃতি, দেশভক্তি, নর-নারীর প্রেম, নানা সাময়িক ঘটনা প্রভৃতি তাঁহার গানের বিষয়বস্তু। কথা ও সুরের এমন মিলন আর কোন গানে দেখা যায় না। বিচিত্র তাঁহার গানের সুর, বিভিন্ন তাহার ভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে এবং এক অলৌকিক আনন্দরসে হৃদয় অভিষিক্ত করে। গানের প্রভাবে আমাদের ভাব-কল্পনার এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যথার্থই বলিয়াছেন,—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।

সমাপ্ত